ষষ্ঠ অধ্যায়

তেভাগা আন্দোলন ও বাংলা উপন্যাস:

বিশেষ পাঠ-

‘নয়নপুরের মাটি’ – ‘লখীন্দর দিগার’ – ‘স্বজনভূমি’

ষষ্ঠ অধ্যায়

তেভাগা আন্দোলন ও বাংলা উপন্যাস:

বিশেষ পাঠ- 'নয়নপুরের মাটি' – 'লখীন্দর দিগার' – 'স্বজনভূমি'

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বাংলাদেশে যে গুরুত্বপূর্ণ কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, সেটি তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। নিপীড়িত কৃষক সমাজ নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়ে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল তেভাগায়। অবশ্য কৃষক বিদ্রোহ ভারতে বা বাংলায় নুতন কিছু নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে। ব্রিটিশ বেনিয়ারা নিজেদের হুকুমতাকে পোক্ত করার জন্যই ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পত্তন করে। সেখানে জমিদারদের রাজস্ব নির্দিষ্ট থাকলেও কৃষকদের খাজনার কোনও সীমা পরিসীমা ছিল না। জমিদাররাই হয়ে দাঁড়াল সমাজের প্রভু, জমিদারি হয়ে উঠেছিল মানমর্যাদার প্রতীক। নবীন জমিদারেরা দূরদূরান্তের জমি ক্রয় করতে লাগল। বড়ো জমিদাররা তাদের বিশাল জমিদারি তুলনায় ছোট জমিদারকে পত্তনি দিল, তারা আবার নিচের কয়েকজনকে পত্তনির এলাকা ভাগ করে দিল। এরা প্রত্যেকেই নিজেকে যা দিতে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি আদায় করতে শুরু করল। এইভাবে কৃষক ও সরকারের মধ্যে বহু স্তরের সৃষ্টি হল। খাজনাই যে শুধু বাড়তে থাকল তাই নয় তার চেয়ে বেশি বাড়ল নানা রকমের আবওয়াবের জুলুম। কৃষি উৎপাদন কমতে থাকল।

আবার অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণীর বড় অংশ কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে কর্মহীন হয়ে কৃষিক্ষেত্রে ভীড় জমায়। এবং কুটির শিল্পে জড়িত লোকজনও কৃষিক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করল। ভারতের কৃষি বিশ্বপুঁজিবাদের অন্তর্ভুক্ত হল। শিল্পের কাঁচামালের জন্য কৃষিপণ্যের

উপর জোর পড়তে থাকল, কমতে থাকল খাদ্য ফসলের উৎপাদন। দুর্ভিক্ষ কৃষকদের নিত্যসঙ্গী হয়ে পড়ল। এছাড়াও নানাভাবে তারা শোষিত হতে লাগল। ধীরে ধীরে কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। গান্ধী যুগে কংগ্রেস কৃষক সংগঠনে আগ্রহী হয়েছিল। ১৯৩৬ থেকে সারা ভারত কৃষক সভা গরিব চাষি এবং খাজনা দেওয়া মানুষের অভাব অভিযোগ নিয়ে ভাবিত ছিল। বঙ্গদেশে কৃষক আন্দোলন শুরু হয় ১৯৩৭ থেকে যখন কৃষিজাত পণ্যের দাম বাড়তে থাকে। ১৯৩৯ এর শরতে কিসান সভা ফ্লাউড কমিশন প্রস্তাবের বিরোধিতার ডাক দেয়। উত্তরবঙ্গ হয়ে ওঠে তেভাগা আন্দোলনের কেন্দ্র, তেভাগা স্ফুলিঙ্গ ছিল মেদিনীপুর, ২৪ পরগনাতেও। প্রথম অধ্যায়ে তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি।

এই তেভাগা লড়াই ছিল অনশন জর্জরিত মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই। আমাদের আলোচ্য অধ্যায়ের বিষয় বাংলা কথাসাহিত্যে তেভাগা আন্দোলন। এই আন্দোলন(১৯৪৬-৪৯), কীভাবে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে, কীভাবে দারিদ্র্যক্লিষ্ট খেটে খাওয়া মানুষদের কথা বাংলা কথা সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠল, তা দেখার চেষ্টা করব।

প্রথমেই আমরা গুণময় মান্নার 'লখীন্দর দিগার' উপন্যাসটির আলোচনা করব।

গুণময় মান্না বাংলা সাহিত্যে এক স্বল্পালোচিত কথাকার, তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক লিখেছেন— "যে সব গুণের জন্য উপন্যাস হয়ে ওঠে আলোচ্য, গুনময় মান্নার অধিকাংশ উপন্যাসে সে সব গুণ বেশি থাকা সত্ত্বেও রসজ্ঞ আলোচকরা তাঁকে তেমন পাংক্তেয় করেন নি, এ বড়ো দুঃখের কথা। রোমান্টিকতা-বিরোধী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি যদি উপন্যাসের একটি ধর্ম হয় তাহলে তো তাঁর অনেক উপন্যাসই আলোচ্য হয়ে উঠতে পারত।"[১] অর্থাৎ রোমান্টিক ভাবালুতাকে সর্তকতার সঙ্গে বিসর্জন দিয়ে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও তাদের কর্মময়তাকে অনুসরণ করতে চেয়েছেন লেখক। "লখীন্দর দিগার'

উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন— "বাংলার পৌর সমাজের নিম্নবর্গীয় কৃষক জনতা কীভাবে দ্বন্দ্বকন্টকিত রাজনৈতিক সময়ে রাষ্ট্রীয় প্রতাপের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছিল এবং কীভাবে ঐ সময়ের তীব্র অভিঘাতে রূপান্তরিত হচ্ছিল অন্তেবাসীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থান— তারই জীবন্ত আলেখ্য হলো 'লখীন্দর দিগার'।"[২]

এই উপন্যাসে রণদিভে পর্বের জঙ্গি কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় কৃষক চেতনার বিবর্তনকে লেখক ধরতে চেয়েছেন। উপন্যাসটি রচিত হয়েছে ১৯৫০ সালে। "স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম যখন গ্রামীণ সামন্ততন্ত্র ও রাষ্ট্রশক্তির আতাঁতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রূপান্তরিত হচ্ছে — সেসময় মেদিনীপুর জেলার অখ্যাত একটি গ্রাম কীভাবে তার তরঙ্গ বিহ্লোভে আলোড়িত হলো, তারই প্রতিবেদন 'লখীন্দর দিগার'।"[৩]

উপন্যাসের আরম্ভ তেরশো পঞ্চান্ন সালের সতেরোই অগ্রহায়ণ সকালবেলা।'[৪] অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার দেড় বছরের মধ্যেই শুরু হয়েছে উপন্যাসের ঘটনা। উপন্যাসে নানাসূত্রে উঠে এসেছে ৪২ এর আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, 'লাঙল যার জমি তার' শ্লোগান এবং জঙ্গি কৃষক আন্দোলনের রাজনীতি। ভূমি কেন্দ্রিক সামাজিক শক্তিসমূহ বিশেষত মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা— সবই উঠে এসেছে উপন্যাসে। এছাড়াও উপন্যাসটিতে কৃষক সংগঠন ও কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নিরপেহ্ল বিবরণও রয়েছে।

উপন্যাসের শুরুতেই মেদিনীপুরের এক অখ্যাত গ্রামের কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। এরা কোনও কৃষক সংগঠনের সদস্য নয়। লখীন্দর, রাম, অখিল জমিতে লাঙল দিতে দিতে দেখে ঝাঁকরার ফনীবাবু আর শ্যামচন্দ্র হেঁটে বাঁকায় যাচ্ছেন ওখান থেকে বাস ধরে মহকুমা শহর ঘাটালে যাওয়ার জন্য। তাঁরা ফৌজদারি আদালতে কাজ করেন বলে গ্রামের চাষিরা তাঁদের ভয়ে হোক - ভক্তিতে হোক, খাতির করে। কিন্তু

নিজেরা নিতান্ত দায়ে না পড়লে ঘাটালে যাওয়ার কথা তারা ভাবতে পারে না। নিতান্তই হ্লুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ তাদের জীবন। কিন্তু তারা তাদের কাজকে ছোট বলে ভাবতে পারে না। তারা ভাবতে শিখেছে 'উকিল মুক্তার আর চাষীমানুষ সব এক দরের লোক," যদিও বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝে তারা দোল খায়। তাদের ভাবজগত রামায়ণ,মহাভারত, গীতার পাপ-পূণ্য বোধের ভাবাদর্শ দ্বারা চালিত। তাই রামের মনে হয় সকল কাজ যদি ভগবানের সৃষ্টি "থালে ইটা বড় উটা ছোট হবে কী করে।"[৫] তখন তার মনে পড়ে যায় রামচন্দ্রও চণ্ডালকে 'মিতা' বলেছিলেন। লখীন্দর বলে "সে চণ্ডালটি যদি তার কাজটি না করত, ফলে রামচন্দ্রের কাজ চলত কী করে। আজ তুমি চাষী, তোমার হাল বন্দ কর দিকিনি,কালকে দেশের উকিল মুক্তাররা দেখি কী খায়।"[৬] সাধারণ অধীন মানুষগুলোর মধ্যে নিজেদের মর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ গড়ে উঠেছে দেখা যায়। লেখাপড়া শিখতে পারে নি বলে তাদের মধ্যে একটা দুঃখবোধও গড়ে ওঠে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র যখন তাদের দমনের নামে নারীর শ্লীলতাহানির মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত হয় তখন তারা মুক বধিরের মতো থাকে, জোরালো প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায় না। রাম প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে না পেয়ে উল্টে নির্যতিতা স্ত্রীর উপর নিজের পুরুষত্ব জাহির করে নিষ্ফল প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

লখীন্দরও প্রতিবাদের ভাষা না পেয়ে রামকে সান্তনা জানায় "ভাই রাম, তমাকে কী আর বলব ভাই। ভগমান কিছু বলার রাখে নি। তা মাথা ঠাণ্ডা রাখবে, সব সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখবে। উপরে ভগমান আছে।"[৭] সব নির্যাতন তারা মুখ বুজেই সয়ে চলে তা সে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনই হোক বা জমির মালিকেরই হোক। জমির মালিক ভাগচাষি লখীন্দরের প্রতিবেশি মহীন্দকে মেহনত বাবদ প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দেয় না, প্রয়োজনীয় সার চাইলে দিতে অস্বীকার করে এবং চাষ নষ্ট হলে শাস্তির হুমকি দেয়। তখন বড় বিচলিত হয়ে পড়ে মহীন্দ ওরফে মহেন্দ্র। অসহায় হ্লোভ ঝরে পড়ে তার কথায়,"আমি কী চাষী লয়, যে আমাকে উ সব কথা

বলা? তা আমার ভাবনাটা বুঝি কম?..... বলি তমার লয় পাঁচটা আয় আছে, ইটা গেলে উটা থাকবে, আমার আর কী আছে শুনি? কিছুহ্ণ চুপ করে থাকে মহেন্দ্র, তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'সব সওয়া যায়, কিন্তু অরা বেশি হীনছিন করে সেটা সইতে পারিনি।"[৮] লখীন্দর বোঝে সে কথা, কারণ "চাষীর ওপর দরদ কারো নেই। যদি লাভ হল তো হল, নইলে সে চাষীর দিকে ফিরে তাকাবে না কেউ।"[৯]

তেভাগা আন্দোলনের ফলস্বরূপ কৃষকদের মধ্যে চেতনা জাগ্রত হলেও স্বাধীন ভারতে তাদের অবস্থানগত বিশেষ পার্থক্য অনুভূত হয় নি। ইংরেজ প্রভু না থাকলেও সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের দ্বারা তারা ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই তাদের মনোজগতকে ঢেকে রাখে উচ্চবর্গীয় পাপপূণ্য-নীতি বোধের শিহ্লা। আসলে নিজেদের শোষণতন্ত্র সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় এই সামন্ততান্ত্রিক নীতিবোধের হাতিয়ারের। তাই কৃষহ্লমোহন ঠাকুর শাসকবর্গের উপযোগী ভাবাদর্শ কৃষকদের মধ্যে প্রচার করেন। প্রাক্তন কংগ্রেসী এই ভট্টাচার্য ঠাকুর নিজগুণে কৃষকদের সম্ভ্রম আদায় করে নিতে পেরেছেন। তাই রাষ্ট্রীয় শাসকবর্গ রামের স্ত্রীর ওপর পাশবিক অত্যাচার করলে লখীন্দরের হৃদয়ের আকুল জিজ্ঞাসা "মানুষ ছোট বলে কি তার অপমান করতে হবে?" এই প্রশ্নের উত্তরে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ভট্টাচার্যের অস্পষ্ট উত্তর আসলে এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সপহ্লে কৌশলী পহ্লপাত মাত্র ।

লখীন্দরকে কৃষকদের আশুকর্তব্য বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন— "এই যে তুমি পুলিসের দম্ভের কথা বললে, তা এতো অপমান নয়, যদি তোমরা হাসি মুখে তা সহ্য করতে পার। তেমন হ্লমতা চাই। অত্যাচারীকে তো অত্যাচার দিয়ে ঠেকানো যায় না। শিবকে নীলকণ্ঠ বলে কেন জানো লখীন্দর? শিব নিজের লোভ থেকে যে বিষ উঠেছিল তা পান করে সহ্য করেছিলেন। তা এর চেয়ে সত্য আর মহৎ কী আছে। অপমানকে হজম করেই মানুষ বড় হবে, তাতে অপমানের শেষ হবে লখীন্দর। অপমান না থাকলে অপমান যারা করে

তারাও থাকবে না, যারা অপমান পায় তারাও থাকবে না।"[১০] কৃষহ্লমোহনের বক্তব্যের পেছনের রাজনীতি আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না।

উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই জঙ্গি কৃষক আন্দোলনের নেতা সতীশ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গোবিন্দর উল্লেখে কৃষকদের নির্জীব আনুগত্যের চেতনার আড়ালে সংঘচেতনার সম্ভাব্য উদ্বোধনের ইঙ্গিত বয়েছে। কৃষকদের নিজেদের কথোপকথনের মধ্যে আমরা তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদার অর্ধস্ফুট আকাঙহ্লা রয়েছে দেখতে পাই। অথচ তারা কোনো সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্পর্শে নেই। ফেরার কৃষক আন্দোলনের নেতাদের খোঁজার নাম করে রাষ্ট্রযন্ত্র যে অকারণে তাদের নিগ্রহ করে চলেছে তা তারা অনুধাবন করতে পেরেছে। লেখকের বর্ণনায় পুলিশের ঘর সার্চের ছবি ধরা পড়েছে।—"দুটো ঘরেই ওরা খোঁজ করেছে। বাসন-কোসন বাক্সপত্র নেড়েছে মাত্র। এ ঘরে বিছানাপত্র টেনেটুনে দেখেছে, ভাঙাটিনের তোরঙ্গটা থেকে কাপড়গুলো বের করে দেখেছে এই যা। কেবলমাত্র একটা জিনিস নষ্ট করছে ওরা, গোবিন্দর মাথায় দেওয়া বালিশটাকে ছিঁড়ে ভেতরটা দেখেছে।"[১১] অদূর অতীতের কৃষক আন্দোলনের স্মৃতি তাদের মনে কতকগুলো প্রশ্নের জন্ম দিলেও সামগ্রিকভাবে প্রতিবাদ করতে তারা এখনও অপারগ। একদিকে তাদের গোবিন্দ মিত্রের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা, কারণ "গত বছর যে খুব বড় একটা খেত মজুর আন্দোলন হয়ে গেল, সেই আন্দোলনের সময় ছিল ও, সেই আন্দোলন পরিচালনা করেছে। আর সেই সময় থেকেই পুলিশ ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"[১২] অপর দিকে তাদের মনে সংশয় " পুলিশের দোষ না গ্রামবাসীর দোষ,যারা পালিয়ে বেড়ায় তারাই এর জন্যে দায়ী না তারাই হচ্ছে সাধারণ এবং গরীবের মা-বাপ?"[১৩] অথচ কৃষহ্লমোহন প্রচার করছেন গোবিন্দ মিত্র খুনী। সুতরাং লেখক বুঝিয়েছেন যে দোদুল্যমানতার পেছনে সক্রিয় রয়েছে কৃষহ্লমোহনদের রাজনীতি।

মনু দিগারের জমিতে ধান তোলা নিয়ে জমিদারের সঙ্গে তার লাঠালাঠি হয়, জমিদার

গায়ের জোরে জমির ধান তুলে নিয়ে যেতে চায়। অথচ মনুর বাবার ছিল ভাগের জমি উটা। তা দুবছর চাষের গতিক ছিল খারাপ। মনু ভাল ফসল ফলাতে পারে নি। তাতে জমিদার নিজে লাঙ্গল দিতে আরম্ভ করেছিল গত আষাঢ় মাসে। তখন কৃষকরা সকলে মিলে জমিদারের লাঙল হটিয়ে দিয়েছিল। তারা মনুর হয়ে চাষ করেছিল, ধান বুনেছিল, জমিদার কোনো প্রতিবাদ করে নি। কিন্তু এখন জমিদার মাঠ থেকে সকল ধান তুলে নিয়ে যেতে চায়। ফলে কৃষকরা জমি থেকে ধান তুলে নেয়। লখীন্দরই এই কাজে নেতৃত্ব দেয়। বলে যা হয় হোক। ধান মনু দিগারের খামারে তুলবে কৃষকরা। কেন না ধান ছাড়া কৃষক বাঁচে না। স্বাভাবিক ভাবেই কৃষকরা জমিদারের লেঠেল বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। লাঠির আঘাতে লখীন্দরের মাথা ফেটে যায়।

লখীন্দরের এই নেতৃত্বদানের পেছনে রয়েছে সদ্য অতীত হয়ে যাওয়া তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি। এই প্রতিরোধ নিতান্ত হঠকারী সিদ্ধান্ত নয়। কারণ মনুর এই জমিটুকু চাষ করার সময় তারা জমিদারের মানুষকে হটিয়ে দিয়েছিল। ধান মনুর খামারে তুললে কী পরিণাম হতে পারে, মাঠের তাৎক্ষণিক সভায় সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। কোনো নেতা না থাকলেও কৃষকেরা এই ভেবে সাহস পেয়েছে যে এই মুহূর্তে ধান রক্ষা করতে পারলে পরবর্তীতে গোবিন্দর সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে। "লেতার কাজ লেতারা করবে। আমাদের কাজ আমরা করব। আমরা ধান ত তুলে লি, পরে বুদ্ধি দিবে লেতারা। এই ত গোবিন্দ মিত্তির আছে, ত দরকার হলে ওনারা আমাদের 'মাথা' দিবে বইকি।"[১৪] ধান তুলে নেওয়া— তেভাগার বার্তা এভাবেই সকল কৃষকের কাছে পৌঁছে গেছিল। এর বেশি সংগঠন ও রাজনৈতিক মতাদর্শগত শিক্ষা প্রস্তুতি কিছুই ছিল না। আধিয়ারদের ক্রোধের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই ঘটেছে আধিয়ার আন্দোলনে- কমিউনিস্ট পার্টি অনেক সময় আন্দোলনের, এতটা ব্যাপ্তি ধারণা করতে পারে নি। তবে পুলিশের নজর এড়িয়ে যতদূর সম্ভব তারা ঐ

আন্দোলনগুলিকে সমন্বয় দিতেন, পরামর্শ দিতেন, রণকৌশল ঠিক করতে সাহয্য করতেন। উপন্যাসে ফেরারি নেতাদের এই ভূমিকাই স্পষ্ট হয় কৃষকদের এই প্রত্যয়ে যে ধান তুলে নিতে পারলে গোবিন্দ মিত্তির বা তার দল 'মাথা' দেবে।[১৫]

লখীন্দরের এই নেতৃত্ব দান স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে উঠে এসেছিল। অথচ এই লখীন্দরই কৃষহ্লমোহনের প্রতিষ্ঠানপন্থী রাজনীতির জালে বন্দি ছিল। তার মধ্যে যে দোলাচলতা ছিল তা কাটিয়ে উঠেছে নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। লখীন্দররা যা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করে, বাস্তব পরিস্থিতির চাপেই তার চেতনা রূপান্তরিত হয়। তাই লখীন্দরের নেতৃত্বকারী ভূমিকা গোবিন্দর সঙ্গে আলোচনার পূর্বেই স্থির হয়ে যায়, মধ্যবর্গের বা শিহ্লিত জনের পরামর্শ ব্যতিরেকে। লখীন্দরের এই যে চেতনা উদ্দীপিত হয় তা সময়ের আঁচে উত্তপ্ত হয়েছে। তেভাগার তাজা স্মৃতি, কৃষকসভার গোপন কাজকর্ম— এসবই সাধারণ কৃষকদের চেতনার পালাবদলের হ্লেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল। লখীন্দর ও অন্যান্য সবাই মিলে শিরসার জমিদারের লাঠিয়ালদের প্রতিরোধ করার শক্তি পেয়েছে এই প্রেহ্লিত-বাস্তবতায়- চাষার ধান না হলে চলে না, সুতরাং কৃষকেরা মনুর খামারে ধান তুলবেই। লখীন্দরের এই সিদ্ধান্ত তার নিজের কিন্তু পেছনে রয়েছে গোবিন্দদের উপস্থিতি। অর্থাৎ ইতিহাসের এমন এক সন্ধিহ্লণে মেদিনীপুরের এক অখ্যাত গ্রামের কৃষকরা দাঁড়িয়ে আছে যেখানে তার স্বাধীন সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে তেভাগার ফেরারি কৃষককর্মীদের সক্রিয়তা এবং প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের কৃষক আন্দোলনের স্মৃতি। এই কৃষকদের একদিকে রয়েছে মালিকপহ্ল অর্থাৎ জমিদাররা, যারা নিত্য নতুন কৌশলে কৃষকদের শোষণ প্রক্রিয়া চালিয়ে আসছে, আর তাদের অত্যাচারের বিপহ্লে প্রবল প্রতিরোধ গড়তে চাইছে কৃষক-কর্মীরা, যারা কৃষকদের শোষণের হাত থেকে মুক্তি চায়। অপর দিকে রয়েছে কৃষহ্লমোহনের মতো কংগ্রেসীরা, যারা শাসক বর্গের পহ্লাবলম্বন করে কৃষকদের মননভূমিকে ঔপনিবেশিক শিহ্লা দিয়ে অত্যাচারীর হাতকে শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য

করে।

উপন্যাসে আমরা যে কৃষ্ণমোহনকে দেখি, তিনি ৪২ এর আন্দোলনের সময় একসটার্নমেন্ট আদেশ পেয়ে ঝাঁকরার মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত হন, কৃষকদের তিনি পরামর্শদাতা, লেখকের ভাষায় সত্য অর্থেই 'মা-বাপ'। কৃষকদের সুখে দুঃখে তিনি তাদের পরামর্শ দেন। তিনি কৃষকদের বোঝান "আমাদের দেশ ঠাকুর-দেবতার দেশ। দেবতাকে আমরা ভালোবাসিনে, তাই আমাদের এই অবস্থা আজকাল। দেবতাকে ভালোবাসিলে মানুষ নিজেই দেবতা হয়ে উঠবে।"[১৬] কৃষকেরা তাঁর কাছে জ্ঞানের কথা শুনতে এলে তিনি বলেন—"কথা নিয়েই ব্রাহ্মণের কারবার.. ব্রাহ্মণ তো জ্ঞান আহরণ করবে আর সে কথা অন্যকে জানাবে।"[১৭] এই কৃষ্ণমোহন বিশ্বাস করেন, শিব মহৎ একারণেই যে তিনি নিজের লোভের বিষ নিজেই সংবরণ করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন। কেবল এ পথেই নিজের লোভের পাপ হজম করেই অপমানকে জয় করার পরামর্শ দেন তিনি। তিনি মানেন শিক্ষা, বিদ্যার্জন,বিদ্যাদান এসবে ব্রাহ্মণেরই অধিকার। গোবিন্দ মিত্রের মত সংগ্রামের পথ নয়, ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস রেখেই মানুষ হয়ে উঠবে দেবতা। দরিদ্র জনগণ যখন রাষ্ট্রের প্রতিভূদের কাছে নিজেদের জন্য স্কুল চায়, রাস্তা মেরামত করে দিতে বলে তখন কৃষ্ণমোহনের কাছে এগুলি হলো মানুষের ছোট হওয়ার লক্ষণ, তাঁর ভাষায় ভিক্ষাবৃত্তি। "জানো লখীন্দর মানুষ আজকাল লোভী হয়েছে..... আর লোভ হলে মানুষ হয় পরনির্ভর, নিজের ওপর আর আস্থা থাকে না। তখন শুধু ভিক্ষা করে মানুষ, আজ ইস্কুল দাও, কাল জলের কল দাও, পরশু রাস্তা মেরামত করে দাও... এতে কে ছোট হয়, মানুষ নিজেই ছোট হচ্ছে"।[১৮] তিনি মনে করেন, স্কুল, জলের কল, রাস্তা মেরামত এগুলি প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ব্যাতিরকেই নিজের থেকে করবে কৃষকেরা। আমরা এখানে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এর ভূমিকম্প-পরবর্তী বিহারের অবস্থার সঙ্গে মিল দেখতে পাচ্ছি, সেখানে কংগ্রেসী লাডলীবাবুরা ঢোঁড়াইদের নিজেদের ঘর নিজেদেরই সারাই করে নিতে উৎসাহ

দিচ্ছে। আর ভূমিকম্পের রিলিফের সরকার-কর্তৃক প্রদত্ত টাকা নিজেরা আত্মস্থ করে গরিব মানুষগুলোকে ঠকাচ্ছে। এছাড়াও রাষ্ট্রের প্রতিভূরা ছোট মানুষকে অপমান করবে কেন, রামের স্ত্রীর মর্যাদাহানির ঘটনাকে মাথায় রেখে যখন লখীন্দর তাঁকে এই প্রশ্ন করে, তখন পূজারি কৃষহ্লমোহন উল্টে বলেন, অপমান সহ্য করলে তবেই মুক্তি সম্ভব। কংগ্রেসের চিরাগত বুলি দিয়ে তিনি সমস্ত বিষয়কে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কংগ্রেসের রাজনীতি। তাদের ভাবাদর্শগত অবস্থানও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিম্নবর্গের মানুষের সংগঠিত হওয়াকে তিনি অবান্তর বলে মনে করেন।

অথচ এই কৃষহ্লমোহন শিরসার জমিদারদের বেগার খাটানোর বিরুদ্ধে প্রজাদের খেপিয়েছিলেন। আবার মনু দিগারের ফসল রহ্লা করার ঘটনাকে তিনি কৃষকের অন্যায় বলপ্রয়োগ বলে মনে করেন যদিও মনু দিগারের ভাগচাষের অধিকার চাওয়াকে তিনি অন্যায় বলে মেনে নিতে পারেন না— "কৃষকরা বল প্রয়োগ করেছে, এই তাদের অন্যায়। একশোবার। কিন্তু তাদের যা দাবি সেটা তো ন্যায্য.....।"[১৯] অর্থাৎ তাঁর চরিত্রের মধ্যে একটা দ্বিধা বর্তমান ছিল। বস্তুত বলা যায়, কংগ্রেসের জাতীয় চরিত্র এবং নীতিতে এই দ্বিধা প্রথম থেকেই ছিল। তারা একদিকে নিপীড়িত কৃষকদের শোষণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, আবার জমিদারদেরও স্বার্থ রহ্লা করেছে। তাই 'তৃণাদপি নীচ' যারা তাদের সম্মান দিতে হবে— এই নীতিতে বিশ্বাস করেও শেষপর্যন্ত কৃষহ্লমোহন অর্থনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে জমিদারদেরই স্বার্থরহ্লাকারী। জমিদারদের হাতের ক্রীড়নক স্বরূপ তিনি কাজ করেছেন। জমিদারপহ্লের প্রস্তাব নিয়ে কৃষহ্লমোহন গোবিন্দদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র লখীন্দরের সঙ্গে আলোচনা কালে সরকারি নীতিকে সমস্ত গোলমালের উৎস বলে স্বীকার করে নিয়েছেন তবুও কৃষক সংগ্রামের যৌক্তিকতাকে তিনি স্বীকার করে নিতে পারেন না।

কংগ্রেস ও লিগ সরকার স্বাধীনতা পূর্বকালে তেভাগা আন্দোলনকে মেনে নিতে

পারে নি। কারণ "দেশের অধিকাংশ বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের দেশীয় মালিকরা ছিল সাধারণভাবে কংগ্রেসের পক্ষে। কংগ্রেসের তহবিলে দেশীয় শিল্প-পতিরা যে মুক্ত হস্তে অর্থপ্রদান করতেন সে বিষয়ে ঐতিহাসিকক্লাউড মারকোভিটস্, আদিত্য মুখার্জি, কপিল কুমার, সুনীতি ঘোষ প্রমুখ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কৃষিক্ষেত্রেও কৃষক স্বার্থবিরোধী জমিদার ও জোতদার সম্প্রদায় নিজেদের কংগ্রেসসেবী বলেই পরিচয় দিত। জেলাগুলিতে ও গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের সংগঠন, রাজনীতি ও অস্তিত্ব নির্ভর করত এই ভুস্বামী ও সামন্তশ্রেণির উপর। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস নেতৃত্ব তার শ্রেণি স্বার্থের পরিপন্থী এমন কোনো কাজ করতে রাজী ছিল না, যার দ্বারা কংগ্রেসের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।"[২০] তাই 'দেশের কেন্দ্রীয় শাসন হুমতা বাগিয়ে নেওয়ার' পরও কৃষকদের অবস্থার সামান্য উন্নতিও হয় নি। উপন্যাসে আমরা দেখি লখীন্দর বলছে " এই যে কনগেরেসের বাবুরা রাজত্বি পেল, ত অদের লাভ হল নি? অরা কি এর আগে আমাদিকে লোভ দেখায়নি যে, ইটা হবে, উটা হবে। ইস্কুল পাবি, খাবার পাবি, পরনের কাপড় পাবি, ব্যস, ইটা হলে ত মানুষ বেঁচে যেত। ত তারাই আজ কী করেছে দেখ। এই হলগে ব্যাপার..... লঙ্কায় গেল তে রাবণ হল।'[২১] তাই কৃষক সভার লক্ষ্য ছিল দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রাম। তাদের কথায় — "গেল বারের তেভাগা আন্দোলনের কথা মনে পড়ে আপনাদের। আমরা ধানের ভাগ নিয়ে লড়েছিলাম। এবার আমরা জমি নিয়ে লড়ব। যে চাষী, যে চাষ করবে, জমি তারই । আর কাউকে আমরা মানিনে।"[২২]

আমারা উপন্যাসটিতে কংগ্রেসী শাসনের আরও নমুনা দেখতে পাব। প্রকিওরমেন্ট কার্যক্রমের নির্দেশ দিল সরকার। অর্থাৎ কৃষকেরা সাধারণত যেভাবে ধান বিক্রি করে সেভাবে চলবে না। একটা নির্দিষ্ট দামে সরকারের গুদামে ধান পৌঁছে দিতে হবে। অবশ্য ব্যক্তিগত প্রয়োজন বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত ধানই সরকারকে দিতে হবে। কৃষকেরা ধান দিতে নারাজ হল।

তাদের প্রথম সমস্যা হল দাম নিয়ে। কারণ সরকার যে দাম বেঁধে দিয়েছে সেটা অত্যন্ত কম। তাছাড়া কৃষকদের জীবনের সবচাইতে বড় সম্পদ 'ধান'কে তারা ছেড়ে দিতে রাজি হল না। এবং তাদের ধান মাপার পদ্ধতিও পছন্দ হল না। তাই বিদ্রোহ শুরু হল 'জান দিব তবু ধান দিব না।' তেভাগা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী যারা ফেরার কৃষকসভার সদস্য তারা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিল, তারা চাষিদের সঙ্গে দিনমজুরকেও একত্র নিল, তার বোঝাল "সেবার হ্লে তমজুর আন্দোলন আমরা করলাম, সেটা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তো নয়, অথচ শান্তি-শৃঙ্খলার নামে আমাদের ওরা আক্রমণ করল। আমাদের কর্মীদের জেলে পুরল। আজ হয়তো প্রত্যহ্ল ভাবে দিন-মজুরদের ওপর আক্রমণ আসছেনা, কিন্তু অন্য দিন আসবে।"[২৩]

অতএব সংঘর্ষ বাঁধে, সরকারি নির্দেশ অমান্য করে শিরসা গ্রাম। সরকার পহ্ল জোর করে ধান আদায় করার সিদ্ধান্ত নিল। কৃষকরা জোটবদ্ধ হয়ে বাধা দিতে লাগল। জমিদারবর্গ প্রজাদের 'হেলে বলদ' আটকে রাখলে কৃষকরা জোর করে কেড়ে নিয়ে যায়। আর ধান তোলবার সময়ে কৃষকদের যে মাথার ঠিক থাকে না, তা উপন্যাসে পুলিশের বিভাগীয় চিঠিপত্রে উল্লেখ রয়েছে— এই সময় কৃষকদের মাথার ঠিক থাকে না। কেন, তার সাংবাদিক সুলভ ব্যাখ্যাও আছে "সত্যিই তাই। নানাদিক দিয়ে বিব্রত হতে হয় ওদের। ধান খামারে তোলার সঙ্গে সঙ্গে মহাজন-মালিক, পোষ্য-পরিজন নানাদিক থেকে দাও দাও করবে। আর যখন দেখা যায় সারা বছরের আশা-আকাঙ্হ্লার শেষ ফল যে কে সেই, তখন আর মাথা ঠিক রাখা যায় না।"[২৪] কৃষকরা এই সময় কৃষক সভার সহযোগে মিছিল বের করে। তার মধ্যে তারা সরকারের দালালদের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এদিক সরকারপহ্ল ও আন্দোলন দমন করার নামে কঠোর দমন নীতি চালাতে থাকে। কৃষকদের ওপর পুলিশ ও সেনাবাহিনী দিয়ে সীমাহীন অত্যাচার চালাতে থাকে। প্রচুর কৃষককে অন্তরীণ করা হয়। অবশ্য কৃষকদের তরফ থেকেও প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয়। গ্রামের অধিকাংশ পুরুষ ও সোমত্থ মেয়েরা

জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপরও পুলিশ এসে তল্লাসির নামে অত্যাচার চালালে পাড়ার মেয়েরা বঁটি, কুড়ুল, ঝাঁটা, কাটারি নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে একটা সশস্ত্র দলকে। সাধারণ কৃষকরা কীভাবে এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন ঔপন্যাসিক উনিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে তার বিবরণ দিয়েছেন, "সমস্ত অভিযানটা যিনি পরিচালনা করছিলেন, সুপারিনটেডেন্ট অব পুলিস, মেদিনীপুর, তাঁর কাছে এটা রহস্য। ছোট ন'বছরের ছেলে। জিজ্ঞেস করা হল, 'বল, তোর বাপ কোথায়? নইল দেখেছিস বন্দুক।' 'মারবে তো মারো।' বলে দু'কোমরে হাত দিয়ে বুক চেতিয়ে দাঁড়ায়। হাসি পায়, ওর বীরত্ব দেখে, কিন্তু আশ্চর্য? সত্যিই আশ্চর্য।..... অজস্র গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু আসল কর্মী যারা তাদের দু-একজন ছাড়া কেউই ধরা পড়ে নি।"[২৫]

কিন্তু বিচারের নামে প্রহসনেও এই হতভাগ্য কৃষকগুলোকে নাজেহাল হতে হয়। একটি লোক বাকি নাই এই দশখানা গাঁয়ে। কোনরকম শাস্তি প্রত্যেকেই পেয়েছে। যারা অন্তরীণ হয় নি, তারা ধরা পড়েছে। এদের সংখ্যাই বেশি আর এদের অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ। পনেরো দিন ছাড়া ওদের ঘাটাল- মেদিনীপুর ছুটতে হয়, পাঁচ মাস হয়ে গেল ওদের এখনো মামলা রুজু হয় নি। যেতে আসতে টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে। ঢেঁকি পর্যন্ত বিক্রি করছে কেউ কেউ। দেশটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

এসবের পর কৃষহ্লমোহন কিছুটা সক্রিয় হয়েছেন জমিদার অনুতোষবাবুর শান্তি অভিযানের কাজে। সারা জীবন যে কৃষকদের চেতনাজগৎ, পাপ-পূণ্যবোধ, ধর্ম-অর্ধমবোধ কৃষহ্লমোহনদের শিহ্লায় গড়ে উঠেছিল সেই লখীন্দর দাদা ঠাকুরের মুখের উপর বলে "গোলমাল আরম্ভ হল কী লিয়ে, না সরকারের বাঁধা দামে চাষীরা ধান দিবে নি। কিন্তু চাষীদের কথাই ত লেয্য ছিল, তাদের উব্‌রে জোর করা হল কেনে? এই রকম অন্যায় যদি হরদম হয়, থালে শান্তি এসবে কী করে....."।[২৬] অর্থাৎ প্রভুদের তৈরি করা মানসিকতার বিরুদ্ধে স্থির হয়েছে সে, তাই অন্তরীণ আদেশ ভঙ্গ করে ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবসের জনসভায় বক্তৃতা

করেছে। 'মারামারি খুব খারাপ জিনিস' - কৃষহ্লমোহন ঠাকুরের এই কথা পুনরাবৃত্তি করেও লখীন্দর সুধীরকে শেষ পর্যন্ত গোপন ডেরায় লড়াইয়ের কৌশল শেখানোর জন্য পাঠানোর ব্যাপারটাকে যুধিষ্ঠির দ্বারা অর্জুনকে অস্ত্রশিহ্লার প্রেরণের সঙ্গে তুলনা করেছে। গুণময় রাজনৈতিক সময়ের আধারে স্থাপিত পাত্রপাত্রীর চৈতন্যের জগৎকে অনুসরণ করতে গিয়ে কোথাও সতীশ গোবিন্দদের ভাষা আর রাম-লখীন্দরের ভাষাকে এক করে দেন নি। বরং প্রতি পদে তাদের পিছুর টান, বিপ্-বী রাজনীতি সম্পর্কে সংশয় সন্দেহকে প্রকাশ করেছেন। পাপ-পূণ্য, স্ত্রী পুত্রকে ভালোবাসার কথা, রাষ্ট্রীয় উৎপীড়নে কৃষকদের ঘরে গরু মারা গেলে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা— এই বাস্তবতার পাশাপাশি ঔপন্যাসিক দেখাচ্ছেন, ক্রমশ লখীন্দররা কৃষহ্লমোহনদের বৃত্তের থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে। তাই উপন্যাসে লখীন্দর এবং কৃষহ্লমোহনের সংলাপের প্রেহ্লাপটে তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ রয়েছে— "আশ্চর্যের বিষয়, আগে ঠাকুরমশায়ের সামনে লখীন্দর বিশেষ কোন কথা বলত না, বললেও,ছাত্রের মতো প্রশ্ন শুধতো, তার উত্তর জেনে নিত। কিন্তু এখন সে অনর্গল বকে যাচ্ছে। এতদিন চুপ করে থেকে তার বক্তব্য অনেক বেশি বেড়ে গেছে বলে মনে হয়।"[২৭] ইঙ্গিতময় এই বিবৃতিতে লেখক জানিয়ে দেন চুপ করে থাকার পালা শেষ হয়েছে। এখন এসেছে নতুন বয়ানের পালা। তাই এখন কৃষকদের মান অপমান, তাদের জমি, তাদের ভালোমন্দ সব তাদেরই দেখতে হবে। আকাশের জ্বলন্ত তারাগুলোকে দেখে তাই তাদের প্রদীপের মতো মনে হয়। সেই প্রদীপের আলোয় নব চেতনার আলোকে পথ চিনে নেবে লখীন্দররা। এভাবেই ভবিষ্যতের অবিরাম শ্রেণিসংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে। লেখক এখানে পালাবদলের সংগ্রামময় ইতিহাসের পর্বারম্ভের বিশ্বস্ত ভাষ্যকার।

২

স্বাধীনতা- উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের একজন অন্যতম শক্তিশালী কথাকার সমরেশ

বসু। একই সঙ্গে বিতর্কিতও। তাঁর রচনাকর্ম বিপুল। প্রায় দুশো গ্রন্থ প্রণেতা সমরেশ বসুর রচিত প্রথম উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি' উপন্যাসটি আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি।

সমরেশ বসুর রচনাকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করেছেন বিভিন্ন সমলোচকেরা। লেখকের একান্ত নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতায় সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই নিম্নজীবী এবং শ্রমজীবী মানুষেরা তাঁর গল্প উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। আসলে ব্যক্তিগত জীবন যাপনে তিনি আ-মৃত্যু ছিলেন মানুষেরই কাছাকাছি। যখন যে রকম মানুষের চরিত্র তাঁকে আকৃষ্ট করেছে তখনই সেই মানুষকে আগাগোড়া আষ্টেপৃষ্টে বেঁধেছেন তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে তিনি ছিলেন নিম্নজীবী-শ্রমজীবী-সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে। আতপুরের তরফদার পাড়ায় থাকার সুবাদে বস্তিজীবন ও শ্রমিকদের সাথে, নিম্নজীবী তাঁতী,চাষি,মাঝিদের সাথে তাঁর ছিল সর্বহ্লণ চলাফেরা— ওঠাবসা। এরই মাঝে জীবনের প্রথম পর্বে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান ও শ্রমিকফ্রন্টে বিভিন্ন কাজের সুবাদে তাদের খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য নিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবনের হাতেখড়ি। একদিকে পার্টি জীবন, তার আদর্শ, পড়াশুনো অন্যদিকে একটাকা চার আনা রোজে ট্রেসারের চাকরি, আতপুরের রাইফেল ফ্যাক্টরির নক্সাঘরে। পেশাদার লেখক হবার আগে ডিম বিক্রি সহ বিচিত্র পেশা প্রান্তিক জীবন ও চেতনাকে কাছে থেকে বোঝার পহ্লে সহায়ক হয়ে উঠেছে। নিম্নবিত্ত ও শ্রমিক জীবনচর্যাকে তিনি দেখেছেন এবং অনুভব করেছেন নিজের অস্থিমজ্জায়। সেই কারণেই ব্যক্তি অভিজ্ঞতার নিরিখে তা এত প্রাঞ্জল ও বাস্তব হয়ে উঠতে পেরেছে। তাঁর প্রথম লিখিত উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি'তে ৪০ এর দশকের কৃষক সংগ্রাম, বিশেষত তেভাগার লড়াইর ছায়াপাত ঘটেছে।

এই উপন্যাসের আলোচনায় প্রথমেই লেখকের মন্তব্য প্রাণিধানযোগ্য— 'মাটি এই উপন্যাসের একটি বিশেষ চরিত্র, কারণ প্রধান পুরুষ চরিত্র মাটির মূর্তি গড়ার গ্রামীণ শিল্পী—

আর সেইসব মূর্তিই তার গৃহ, সমাজ এবং ব্যক্তি জীবনের সকল কিছুর মূলাধারে ছিল।"[২৮] শিল্পী মহিমের সমগ্র শিল্পসত্তার মূলে ছিল নিজের গ্রাম নয়নপুর। এই গ্রাম, তার মাটি এবং তার মানুষগুলির অস্তিত্ব তার ব্যক্তিত্বে মিলেমিশে একাকার, আর এখান থেকেই সূত্রপাত শিল্পের। একটি শিল্পকর্ম তখনই সার্থক যখন তা জীবনের সঙ্গে একাকার, জীবনে যুক্ত হয়েই শিল্প এবং শিল্পীর পথচলা।

নয়নপুরের মাটির কোলে বেড়ে ওঠা মহিম সেই গ্রামেরই একজন মৃৎ শিল্পী। নরম কাঁকড়বিহীন মাটি আর-জল— এই দুই উপাদানেই সে প্রকাশ করে তার বক্তব্য। প্রথাগত শিল্পা কোথাও তার হয় নি। মনের টানে আর দুর্বার ইচ্ছাশক্তিতে কুমোরদের কাজ দেখে দেখেই তার শিল্পা। তবে অর্জুন পাল মশাই যিনি কুমোরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনি ছিলেন তার গুরু। প্রথমে ছিল তার মূর্তি গড়ার চেষ্টা। সে চেষ্টা একদিনে আয়ত্ত হয় নি। মনে হত "মনের চেহারা, হাতের মাটিতে দেয় না ধরা, আ! সে কি অসহ্য কষ্ট আর অশান্তি। যা চাই,তা কেন পাই না? আবার গেছে ছুটে ছুটে, দেখেছে কারিগরদের কাজ। আবার তৈরি করেছে মূর্তি।"[২৯] এ তো মনের চেহারা প্রকাশ না পাওয়ায় এক শিল্পীর মনের যন্ত্রণা। সে অর্জুন পালের প্রতিটি কাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। একসময় কিশোর মহিম বানিয়েছে একহাত লম্বা দশভূজা মূর্তি। এই সময়ে তার জীবনে এল পাগলা গৌরাঙ্গ। এই পাগলা গৌরাঙ্গ চরিত্রটি একজন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী কমিউনিস্ট। তার চিন্তা,চেতনা, মতবাদ সবটাই সাম্যবাদ আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গ্রামসমাজকে টেনে নিয়ে যাওয়ার বাসনায় উদ্বুদ্ধ। পাগলা গৌরাঙ্গই প্রথম মহিমকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল। কারণ তার বিশ্বাস ছিল গ্রাম মহিমের মতো শিল্পীর যোগ্য স্থান নয়। কলকাতায় মহিম বুদ্ধ ও পুরাণের বিভিন্ন দেব দেবীব মূর্তি বানাল নতুন আঙ্গিকে । কিন্তু নয়নপুরের মাটির টান, তার আবাল্যের পরিচিত গ্রামের টান তাকে কলকাতায় আটকে রাখতে পারে নি। দাদা ভরত ও বৌদি অহল্যা তাকে গ্রামে ফিরিয়ে আনল।

গ্রামের জমিদার হেমচন্দ্র বোসমশাই মহিমকে তাঁর বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেছেন। তিনি জমিদার হলেও গান্ধী-আদর্শে মানুষ। তাই মহিমের শিল্পীসত্তা তাঁর কাছে স্বীকৃত। তিনি চান মহিম তাঁদের বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা গড়ুক। তিনি মহিমকে শিল্পী হিসেবে মান্যতা দিলেও চিনিয়ে দিতে ভোলেন না তার শ্রেণিগত অবস্থানকে। "সত্যি বাংলাদেশের চাষীদের যে সমাজব্যবস্থা, তার মধ্যে তোমার এ আত্মপ্রকাশ একটা বিস্ময়েরই কথা। আশ্চর্য চাষীর ঘরের ছেলে তুমি।"[৩০] মহিম তার বর্গগত অবস্থানটি বুঝতে পারল। জমিদারের প্রশংসা নিঃসন্দেহে করুণামিশ্রিত। অবজ্ঞা করতে পারলেই যেন ভাল হত হেমবাবুর পক্ষে। মহিম এই প্রবল আত্মসম্মানজ্ঞান অর্জন করেছে বাবা দশরথের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে। দশরথ মুক্তি পেতে চেয়েছিল দারিদ্র্য থেকে। কারণ ক্ষুব্ধ দশরথ দেখেছিল "কি প্রচণ্ড ঘৃণায়-দীনতায়-হীনতায় মিশে তাদের জীবন। জাতি হিসেবে বর্ণহিন্দুদের প্রবল প্রতাপ, ছোট জাতকে অপমান করবার মহান অধিকার নিয়েই জন্মেছে যেন এই বর্ণহিন্দুরা। প্রতিটি সামান্য কারণে তাই দশরথ চিরকাল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এই সমাজের বিরুদ্ধে। প্রতিটি তুচ্ছতাচ্ছিল্য—তাদের প্রতি বর্ণহিন্দুদের ফিরিয়ে দিয়েছে সে অত্যন্ত বড় প্রতিবাদ করে"।[৩১] তাই বর্ণকুলীন না হলেও বিত্তকুলীন হয়েছে সে। নিজে চাষি হলেও ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবে ভেবেছিল। অবশ্য বড়ছেলে ভরত সেদিক দিয়ে গেল না। কিন্তু ছোটছেলে মহিম শিল্পী। প্রভুশক্তির অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার প্রত্যুত্তরে সে জমিদারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, নিজের অভাব অনটন সত্ত্বেও। দশরথের অবর্তমানে পরিবারে মাত্র তিনজন মানুষ। ভরত, তার বউ অহল্যা এবং মহিম। ন'বছর বয়সে অহল্যা বিয়ে হয়ে যখন এ বাড়িতে আসে তখন মহিম পাঁচ বছরের শিশু। সেই থেকে বন্ধুত্ব দেবর-ভাজে। ভরত শুধু মামলা লড়ে আর কাছারি বাড়িতে যায়। অহল্যার সে স্বামী, কিন্তু বন্ধু নয়। এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের কুসুমের স্বামী পরাণের কথা উল্লেখ করা যায়। পরাণ অনেকটা ভরতেরই মতো।

কুসুমের তেইশ বছরের ভরা যৌবনের কাছে পরাণ কিছুই নয়— একটা নির্জীব মানুষ। ভরতও যেন অহল্যার কাছে তাই। তবে অহল্যা অনেক বেশি শান্ত গাম্ভীর্যে ভরপুর। সন্তানাদি নেই বলে প্রাণে তার ব্যথা। কুসুমের কিন্তু তা নয়। কুসুম সচেতন মনে ভালোবাসে শশীকে। আর অহল্যার অবচেতনে খেলা করে মহিমের প্রতি একটা চোরা টান। আরও একটি নারী চরিত্র মহিমকে ঘিরে রয়েছে। সে হচ্ছে জমিদার হেমচন্দ্র বোসের পুত্রবধূ উমা, যার স্বামী লণ্ডনে প্রবাসী। বিদুষী উমা কলেজের বন্ধু গৌরাঙ্গের কাছে মহিমের শিল্পকীর্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছে। উমা চায় মহিম গান্ধী কিংবা রবীন্দ্রনাথের মূর্তি গড়ুক, বর্হিবিশ্বে প্রতিষ্ঠা পাক, তাই তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চেয়েছে বৃন্তচ্যুত করে। ক্রমে উমা শিল্প অপেহ্লা শিল্পীকেই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। তাকে লোভ দেখিয়েছে কলকাতার, অর্থের এবং সর্বোপরি নিজের ভরা যৌবনের। মহিম দিশেহারা হয়েছে তবু যন্ত্রণায় হ্লতবিহ্লত হয়েও নিজের পথ চিনে নিতে ভুল করে নি। যদিও এ পথে অহল্যাই তার প্রধান সঙ্গী। অহল্যার সাথে তার নাড়ির টান। অহল্যা তাকে স্নেহে, প্রেমে, বন্ধুত্বে বেঁধে রেখেছে। তার শিল্পীসত্তার যন্ত্রণাকে সে উপলব্ধি করেছে অন্তর দিয়ে। কারণ তার মধ্যেও ছিল সূক্ষ্ম শিল্পবোধের অস্তিত্ব। মহিমের প্রতি টান, ভরতের প্রতি কর্তব্যবোধ সত্ত্বেও অহল্যার বাঁধা বীণার তার সর্বদাই বাজত বেসুরে।

গোবিন্দ-বনলতা-আচার্য উপকাহিনিতে লেখক দেখিয়েছেন, বর্গ-বর্ণ-বিভক্ত সামন্ত সমাজে ধর্মকে প্রান্তিকায়নের আয়ুধ হিসেবেই ব্যবহার করা হয়। গোবিন্দ ছিল এক ধর্মনিষ্ঠ যুবক, রাজপুরের আচার্যের শিষ্য। যদিও নিজের বাবার তন্ত্র সাধনা, তার মৃত্যু, তার জীবনযাপনই ছিল তার আদর্শ। ধর্মের আদর্শের বিপরীতে সে কখনোই বনলতার সাহচর্যকে স্বীকার করে নি। কোথায় যেন বেধেছে; মনে হয়েছে গুরুবাদই শ্রেয়— নারী তুচ্ছ। কিন্তু জীবনের একটি পর্যায়ে তাকে মেনে নিতে হয়েছে বনলতার অস্তিত্ব। আর তার চোখ খুলেছে পাগলা গৌরাঙ্গের কথায়। অর্থাৎ সাম্যবাদ ও সংস্কারমুক্ততায় গ্রাম সমাজের মুক্তির ভিতর দিয়ে গোবিন্দর

জীবনেও আসে মুক্তি। আর একটি চরিত্র রয়েছে কুঁজো কানাই। যে বিকলাঙ্গ বিকৃত দেহ নিয়েও নারীর ভালোবাসা পেতে চায়। স্বপ্ন আছে তারও দু'চোখে। মহিমের শিল্পসৃষ্টির সে একজন বিচক্ষণ সমঝদার। তবু কানাইয়ের মনটা তার অন্দরেই মাথা কুটে মরে। লোক তাকে ভয় করে, মেয়েরা ভয় পায়, কেউ তাকে চায় না। তাই তার সমস্ত রাগ ভগবানের প্রতি, কেন তাকে এমন করে গড়ল। গোবিন্দকে সে বলেছিল দেবতা যদি সত্যিই থাকবেন তবে জগতে এত দুঃখ থাকতে পারে না— "তবে তোমার মুনি দেবতার এত বিবাদ কেন, জগতে এত দুঃখক কেন গো? কালু মালার সোন্দরী টুকটুকে মেইয়ে বুড়ো ভাতারের ঠ্যাঙানি রোজ খায় কেন?..... তোমাদের সবার বড় ভগমানের বেবভোম যদি না হইবে, তবে মোরে কেন জন্ম দিল সম্‌সারে?"[৩২] কুঁজো কানাই কালু মালার সেই সুন্দরী মেয়েকে ভালোবেসে ছিল বলেই তার মার খাওয়া সহ্য হয় না। কিন্তু বিকলাঙ্গ বলে পুরুষ হয়েও আড়াল থেকে দেখা ছাড়া উপায় নেই। কানাইয়ের দুঃখ গোবিন্দর ধর্মনিষ্ঠ বুকে শেল হানে। পাগলা গৌরাঙ্গ তাকে বোঝায়— কুঁজো কানাইয়ের 'ছিষ্টিকত্তা মানুষ, দায়টাও মানুষেরই'। কারণ হিসেবে সে বলে কানাইয়ের জন্মের সময় গ্রাম্য কুসংস্কারবশত হয়তো তার পৃথিবীর বুকে বেরিয়ে আসার পথটা বিস্তৃত ছিল না। অবশ্য মানুষের অশিক্ষা এর জন্য দায়ী। আর নয়তো কানাইয়ের বাবা তার মায়ের ওপর নির্মম অত্যাচার করত। যার ফলস্বরূপ কানাইয়ের শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে। তাই সে কুঁজো। এই নির্মম সত্য গোবিন্দর অর্ন্তজগতকে তোলপাড় করছে। বৈপরীত্য এসেছে তার মধ্যে, আর সবচেয়ে যে আঘাত পেয়ে সে ধর্মের বেড়াজাল থেকে সরে এসেছে, সেই আঘাত তাকে দিয়েছে চক্রবর্তীদের ভাদ্রবৌ অর্থাৎতারই বাবার ভৈরবী। ভাদ্রবৌ একদা ধর্ষিতা হয়েছিল গোবিন্দর ধর্মগুরু আচার্য দ্বারা। তারপর সমাজের বিমুখতায় হয়েছে ভৈরবী। তখন গাঁয়ের মানুষ তার কাছে গেছে রোগ-শোক-মনস্তাপ নিয়ে। পায়ে দিয়েছে ফুলচন্দন— কেউ বুঝে দিয়েছে কেউ না বুঝে। যারা বুঝে দিয়েছিল তারা আজও মালিপাড়ার পতিতাপল্লীতে

তার কাছে যায়। গোবিন্দর ভুল ভেঙেছে। ধর্মের গোঁড়ামি আর তাকে বেঁধে রাখতে পারল না। সে বনলতার মাহাত্ম্য বুঝতে পারল। মিথ্যে ধর্মের মায়া ত্যাগ করল।

এই উপকাহিনির মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন নীচু বর্গের মানুষদের অবস্থা ও অবস্থান। একদিকে জমিদারের শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন। এছাড়াও রয়েছে গরিব প্রজাদের ওপর জোতদারের অত্যাচার, আর অন্যদিকে ধর্মের অনুশাসন ও কুসংস্কার, যে কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে ভাদ্রবৌ সংসারে প্রত্যাখ্যত। সেই বউই ভৈরবী হয়ে গেলে তার পায়ে ফুল চন্দন পড়ে। আর সব শেষে তার স্থান হয় মালিপাড়ায়। গোবিন্দর মতো যেন পাঠকেরও চোখ খুলে দিতে চান লেখক। গোবিন্দ মুক্তি পেতে চায় বনলতার কাছে। এই বনলতার প্রবল জীবনতৃষ্ণা। 'চতুরঙ্গে'র দামিনীর মতো তারও গুরুবাদে কোনও ভক্তি নেই। পিতার ধর্মচর্চা ও আখড়ার ওপর তার কোনো আস্থাই নেই। লেখক তার সম্বন্ধে বলেছেন— "বনলতা শ্যামাঙ্গিনী হলেও সুন্দরী। সাত বছরে তার প্রথম বিয়ে। আবার তেরো বছর বয়সে, তারপর উনিশ। কিন্তু তার জীবনের প্রজাপতির পাখা ঝাপটায় মৃত্যুই এসেছে বারবার, তিনবার তার তিনটি স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়েছে। তবু ভেঙ্গে পড়বার লক্ষণের বদলে, একুশ বছর বয়সে তার বলিষ্ঠ দেহে বিদ্রোহের ছাপটাই চোখে পড়ে।"[৩৩] কারণ সে মৃত্যুর কেউ নয়, সে জীবন রসের রসিক। তাই বনলতা গোবিন্দর ধর্মচর্চা ও ব্রহ্মচর্যকে উপেক্ষা করে। গোবিন্দর কঠোর প্রশ্ন—"তোর কি লজ্জা নেই বনলতা?" সে উত্তর দেয়— "তোমার কাছে"?..... নাই আবার। এত লজ্জা যে মোর রাখবার ঠাঁই নাই গো সাধু"।[৩৪] এ হেন বনলতার কাছেই গোবিন্দর আত্মসমর্পণ; তার গর্ভেই গোবিন্দর সন্তান।

কিন্তু গোবিন্দর মতো মহিম নয়। সে কোনও কিছুতে থিতু হতে পারে না। তার শিল্পী সত্তা বারে বারে আঘাতে জর্জরিত হয় আর জেগে ওঠে। এই আঘাত এসেছে সমাজের বুক থেকে। পাগলা গৌরাঙ্গ গোবিন্দকে বলেছিল— দুঃখ পাসনি, মানুষের কুসংস্কার একটা সোনার

শেকল, হোক্ শেকল, সোনার যে! যাদের চোখে সে সোনা চটে গেছে, তাদের ওই শেকলটুকু ছাড়া সবই গেছে। তাই তারা আজ ঘোর বিবাদ লাগাইছে শেকল ভাঙবে বলে।"[৩৫] সর্বহারার শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই— এই মন্ত্রেই গ্রামের কৃষকদের উদ্দীপিত করতে চেয়েছে গৌরাঙ্গ। তাদের চেতনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছে, তারই প্রেরণায় জমিদার, জোতদারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে নয়নপুরের কৃষকরা। গড়ে উঠেছে কৃষকসভা সমিতি। হ্লে তমজুর হরেরাম, চাষি ভজন, কুঁজো কানাই এমনকি মহিমও মেতে ওঠে। হরেরামের বাড়িতে সকলে একত্রিত হয়ে পাগলা গৌরাঙ্গর বক্তব্যই সকলে আলোচনা করে— "জমিদারে ফাঁকি দিচ্ছে, এ্যাদিন সরকারের খাজনা। সে ফাঁক ধরা প'ড়ে জমিদার তার দেনা শুধতে চায় মোদের মাথা কেটে। কথা নাই-বাত্তা নাই, হুট বলতে খাজনা বেড়ে গেল, কিন্তুক মোরা কেন তা দেব? এ বাড়তি খাজনা না দিলে জমিদার হুজ্জোৎ করবে। করুক, মোরা তবু মানব না। তাছাড়া জমিদারে আজকাল আমাদের হাত থেকে জমি নিয়ে একুনে হাজার হাজার বিঘা অন্য লোকের হাতে তুলে দিচ্ছে। চাষ-জমির খাজনার বিধেন তার আলাদা। তার ফলে আমরা উচ্ছেদ হইলাম। এই জমিদারে আর মালিকে মিলে যা শুরু করেছে তার এট্টা পিতিবিধেন না করলে মোদের কম্মো সারা।"[৩৬] এবার বাড়তি খাজনা বন্ধ ও বেগার খাটার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামে মানুষ। এরপর আগামী বৎসর আসবে 'ভাগচাষীর ভাগের লড়াই।' অর্থাৎ দেশ জোড়া যেন এক লড়াইএর প্রস্তুতি চলছে। আকাশে বাতাসে সর্বত্র যেন তারই ইশারা। 'গত বিধেন ভেঙে' 'নতুন বিধেন' গড়তে চায় কৃষকরা। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই। লেখক দেখেছেন ধর্ম-ঈশ্বরই তার প্রতিরোধের প্রেরণা। 'ধম্মোঘটে'র পূজো দিয়ে কৃষকেরা শুরু করবে সংগ্রাম। সেই পূজার ঘট আর 'ধম্মো দেবে'র মূর্তি তৈরির দায়িত্ব শিল্পী মহিমের উপর, যে মহিম জমিদার বাড়ির দুর্গামূর্তি বানানোর দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে, সে এই দেবতার মূর্তি বানাবে।

মহিম কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তার শিল্প কর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কারণ

পাগল গৌরাঙ্গর শিল্পা সে ভুলতে পারে না। তাই শিল্পকে সে মানুষের বাঁচার তাগিদের সঙ্গে যুক্ত করতে চায়। প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে বহ্নিমান ক্রোধের প্রকাশ মহিমের শিল্পকর্মে। সে মূর্তি গড়ে অখিল মণ্ডলের মৃত মোষের। চাষার সারাজীবনের সঞ্চিত ধনে কেনা প্রিয় মোষটিকে দেনার দায়ে কেড়ে নিয়েছিল অহ্লয়-জোতদার। না খেতে দিয়ে মেরে ফেলেছে সেই প্রাণীটিকে। মোষের মৃতদেহের উপর ফুলে ফুলে কাঁদছে অখিল। শিল্পী মহিমের চোখে অখিলের সব হারানোর যন্ত্রণা ধরা পড়েছে। মহিম তার মাটি সিমেন্টে গড়া মূর্তিতে সেই হৃদয় নিংড়ানো যন্ত্রণা ও যাবতীয় দ্রোহকে ফুটিয়ে তুলেছে। আবার এই জমিদার জোতদারদেরই ষড়যন্ত্রে খুন হয় খাজনা বৃদ্ধি ও বেগার খাটানোর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত সংগ্রামের নেতা আধিয়ার হরেরাম। হরেরামের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে বুকে তার আগুন জ্বলে ওঠে। প্লাস্টারের ছাঁচে সে ধরে রাখে এই মুখ, ভজনকে সে বলে,"এতো মুখ নয় ভজন দাদা,শত্তুরের সব্বোনাশা কীর্তি। চাষী মনিষ রে চেরকাল মুই এ মূর্তি দেখিয়ে বেড়াব।"[৩৭] মহিম গড়ে জীবনতৃষহ্লায় হ্লত বিহ্লত কুঁজো কানাইয়ের মূর্তি।

মহিমের এই কীর্তিকে ভয় পেয়েছে জমিদার, কারণ প্রজাবিদ্রোহের বক্তৃতা থেকে মূর্তি যে শক্তিমান, জমিদার তা জানতেন। তাই জমিদার বাঁধা চাকরি দিতে চেয়েছেন মহিমকে। মহিম এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি, স্পষ্টতই প্রত্যাখ্যান করেছে জমিদারের প্রস্তাব। জমিদার গান্ধীজীর একখানি আবহ্ল প্রতিমূর্তি চেয়েছিলেন। তিনি হরেরামের মূর্তিটাও চেয়েছিলেন। কিন্তু মহিম তার সংকল্পে অটল। জমিদার এতে হ্লব্ধ হয়েছেন,কটু কথা বলেছেন। এমনকি ছদ্মকণ্ঠে শাসিয়েছেন। এ ধরণের জমিদার শ্রেণি যদিও গান্ধীবাদী বা কংগ্রেসী, কিন্তু কংগ্রেসী আন্দোলনকে নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে কোনরকম দ্বিধা করতেন না। তাই প্রভুশক্তি পরিকল্পিতভাবে ভরতের ওপর আঘাত হানল। তাদের চক্রান্তে মহিমের ঘর বেদখল হলো। পেয়াদা দিয়ে ভেঙে ফেলা হল তার যাবতীয় সৃষ্টি। কিন্তু একজন শিল্পীর শিল্পসত্তাকে নস্যাৎ করতে পারে

নি। তখনও শিল্পী নতুন করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো বুকের আগুন সৃষ্টিতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। অহল্যার কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হল অমোঘ সত্য "ঠাণ্ডা হও মহী, ওরা এখন শোধ তুলছে, ওরা যে হার মানছে তোমার কাছে। জিততে পারে নাই।"[৩৮] এখানেই মানবতার জয়, যে শিশুমূর্তি গড়েছিল মহিম সে হয়তো বা অহল্যার স্বপ্ন। হয়তো বা হরেরামের বিধবা বউয়ের বিয়ানো মরা ছেলে। হরেরামের বাউরী বউয়ের কান্নায় নয়নপুরের আকাশ বাতাস বাউরী হয়েছিল। তবু নয়নপুর আবার শান্ত হবে। নতুন পথচলা শুরু হবে তার। যেমন মহিম আবার নতুন করে শুরু করবে। গড়বে বউদি অহল্যার মূর্তি। আর তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে। এগিয়ে চলাই শিল্পপথের লক্ষ্য। তরুণ লেখকের রচনায় নিম্নবর্গীয় মানুষের এবং তাদের যন্ত্রণা সংগ্রামের কথা শিল্পমণ্ডিত ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

৩

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বজনভূমি' উপন্যাসে তেভাগার লড়াই ইতিহাসসম্মত ভাবে উঠে এসেছে। এই লেখকের জন্ম ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর ডায়মণ্ডহারবারে। সেই অঞ্চলেই পড়াশুনো আর চাকরিসূত্রে সেই অঞ্চলেই বসবাস। এই অঞ্চলের মাটির সঙ্গে একান্ত পরিচিত লেখক এখানকার লোকেদের সুখ-দুঃখের , মাটির জন্য তাদের আন্দোলনের এক জীবন্ত ছবি তিনি এঁকেছেন 'স্বজন ভূমি' উপন্যাসে। উপন্যাসটি ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত। উপন্যাসে সুন্দরবনের কাকদ্বীপ অঞ্চলের ভাগচাষীদের আন্দোলনের ইতিবৃত্ত, তাদের সুখ-দুঃখকে সামগ্রিকভাবে তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসে 'সুন্দরিকা দুয়ানিয়া'র পাশ ঘিরে যে জনপদ গড়ে উঠেছে সেই অঞ্চলে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। 'আই ফ্যাডে'র পাকা রাস্তা আছে। নদীতে লঞ্চ, ভুট ভুটি ও যোগাযোগের সমস্ত আধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে। অঞ্চলটি মূলত কৃষি প্রধান, অবশ্য মাছ

ধরার ও মীনপালনের ব্যবস্থাও রয়েছে। কলকাতার লোকেরা ইজারা নিয়ে পুকুর খনন করে চিংড়ি চাষ করে। এই অঞ্চলের কৃষকদেরও প্রত্যেকের চাষের জমি ও মাথা গোঁজার জন্য ঘর রয়েছে। অর্থাৎ বিশ শতকের শেষভাগে যখন উপন্যাসটি রচিত হচ্ছে তখন এলাকাটি মোটামুটি স্বচ্ছল ও শান্ত। গঞ্জে বিভিন্ন ধরনের দোকান পাট গড়ে উঠেছে। জনসাধারণের বিনোদনের জন্য রয়েছে ভিডিও হল। যেখানে 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' প্রদর্শিত হচ্ছে। অর্থাৎ মোটামুটি সুখী জনপদ।

অথচ ব্রিটিশ আমলে এই অঞ্চলটি ছিল অত্যন্ত দুর্গম ও বিপদসংকুল। ব্রিটিশের কাছ থেকে নামমাত্র খাজনার বিনিময়ে লাটপত্তনি গড়ে তোলা হয়েছিল। উপন্যাসে আমরা তার বিবরণ পাই। "কৃষহ্লদয়াল বাবুরা তো একদা শ'শ বিঘার মালিক। আঠারোশো পঁচিশ তিরিশে লাট হাসিল করে চাষযোগ্য করে তোলা যে কি কঠিন ছিল তখন। বাপ ঠাকুর্দারা কইতো, কালো জঙ্গলে জোঁক- সাপ যেন ময়াল-আর মা বিশালাহ্লীর বাহন— জিভ দাঁত মেলে ভয়ংকর ডাক ছেড়ে মাটি কাঁপিয়ে দিতো। ইজারা নিলো ব্রিটিশের কাছ থেকে। কিন্তু পাঁচ বছরে জঙ্গল হাসিল করে চাষযোগ্য- বাসযোগ্য করা মুখের কথা। কিন্তু তার পঁচিশ ছাব্বিশ বছর পরেই তো নিরানব্বই বছরের লিজ!"[৩৯] আর জমি বাসযোগ্য করার জন্য লোক আনা হয়েছিল। মেদিনীপুর কন্টাই উড়িষ্যা হাওড়া জেলা থেকে মানুষ, ময়ূরভঞ্জ থেকে আদিবাসী আর তাদের কাঁড়বাঁশ, ভূত সাপের মন্ত্র নিয়ে সংসার পত্তন। সমাজ সংসারের বীজদানা পোঁতার কাল ব্রিটিশের বন্দোবস্ত মূলে আইন, লাটদার আর লাটের শুরু। এই পতিত জমি অধিকাংশ হ্লেত্রেই উদ্ধার করা হয়েছিল চাষিদের বেগার শ্রমের সাহায্যে। অথচ এই পতিত জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করার কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে জোতদারদের দেওয়া হতো। অথচ সত্যিটা হল পতিত জমি উদ্ধারের কাজে "ভূস্বামী যদি প্রাথমিক কিছু ব্যয় করেও থাকেন তবে তা তিনি সযত্নে উশুল করে নিয়েছেন। আবোয়াব বা বেআইনি খাজনা চাপিয়ে। ড.সুনীল সেনের

মতে "১৮৮৫ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের পরেও এটা চলেছিল। অন্যস্থান থেকে কৃষকদের এনে উদ্ধারকৃত জমিতে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বটে, কিন্তু অচিরেই তাদের দখলচ্যুত করে বর্গাদারে পরিণত করা হয়েছিল। সুন্দরবনের লাটদাররা উদ্ধারকৃত জমি থেকে এইভাবেই চাষিদের বঞ্চিত করে তাদের ভাগচাষে ঠেলে দেয়।"[৪০]

এই ভাগচাষিদের কপালে জুটত অশেষ নির্যাতন। অমলেন্দু সেনগুপ্তর 'উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব' গ্রন্থে আমরা ভাগচাষিদের দুর্দশার বর্ণনা পাই। কংসারী হালদার বর্ণনা করেছেন এইভাবে — "১৯৪৩ সালে সাইক্লোন বিধ্বস্ত কাকদ্বীপ ঘুরে এসে খুব খারাপ লাগল। ঠিক করলাম এখানেই কাজ করব এবং ডায়মণ্ডহারবারে অফিস খুলে বসলাম। জুটে গেল যতীন মাইতি আর গুণধর মাইতি। ..... অন্য অঞ্চল থেকে কিন্তু সুন্দরবন এলাকার অবস্থা একেবারেই পৃথক। দুর্ভিক্ষ ও সাইক্লোনের ধাক্কায় মানুষের চরম দুরবস্থা। কাকদ্বীপ সাগরদ্বীপ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অঞ্চল। সেজন্যে এখানে অত্যাচার সবচেয়ে বেশি চলে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে আমাদের স্লোগান — জোতদারদের খামারে নয়— কৃষকের খামারে ধান তোলো। কত যে আদায় করত জোতদার। আড়িবাড়ি। বাড়ি হচ্ছে এক মন ধানে দু'মন ধান ফেরত দিতে হবে। তার উপর দারোয়ানি, কাকতাড়ানি ও ঝাড়ুদারনি। ধান চাষ করে ধান তুলে দিয়ে কৃষক আবার মহাজনের কাছে গেল ধান কর্জ করতে। এটাই পরিচিত দৃশ্য। নিঃস্ব হয়ে জন্মেছে সে— নিঃস্বই থেকে গেল মৃত্যু পর্যন্ত। তার ঘর বাঁধার অধিকার নেই— পুকুর কাটার অধিকার নেই। ছাতা মাথায় দিয়ে কাছারি বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটতে পারবে না সে— পারবে না জুতো পায়ে দিয়ে পথ চলতে। ঘরে সুন্দরী মেয়ে থাকলে তো কথাই নেই। তাকে এক লাট থেকে অন্য লাটে পালিয়ে যেতে হত।"[৪১]

উপন্যাসেও আমরা পাই— "কোনও জোতদার লাটদারের নায়েব ম্যানেজার চাষির

ঘরে পাইক বক্সি পাঠায়েছে নাকি? চাষির বউটাকে, কিংবা তার বয়স্থা মেয়েকে কাছারি বাড়ি রাত কাটাইতে ডেকেছে নাকি! না হলে চাষির ভাগের জমি থেকে উচ্ছেদ করে অন্য লোককে বসাইয়া দিবে? তাহলে উপায়। তাহলে খবর করো গজেন মালি জগন্নাথ মাইতি ....।"[৪২]

উপন্যাসে সুশৃঙ্খল ঘটনাক্রম অনুপস্থিত, লেখক তেভাগা আন্দোলনকারী কৃষক নেতাদের উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে তাদের স্মৃতিচারণার মাধ্যমে সেই আন্দোলনকে পরিস্ফূট করে তুলেছেন। এই স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে তিনি সেই সময়ের ঐতিহাসিক সত্যকে উপন্যাসের সত্যে পরিণত করেছেন। ৪৭-৪৮-এর আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কৃষকেরা স্বনামে উপন্যাসে উপস্থিত, 'উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্-ব' গ্রন্থে আমরা যে সকল আন্দোলনকারীর নাম পাই এবং যেসকল ঘটনার সঙ্গে তারা জড়িত অর্থাৎ আন্দোলনের বিবরণ যেভাবে পাই, উপন্যাসে আমরা সেভাবেই তাদের পরিচয় পাই। তবে উপন্যাসে তা এসেছে পাত্র পাত্রীদের স্মৃতিচারণায়, কখনো আন্দোলনকারীরা নিজেরাই অতীতের স্মৃতিচারণ করেন, কখনো তাদের সন্তান-সন্ততি নাতি-নাতনী বা পাড়া-পড়শি সেই স্মৃতি রোমন্থন করেছে।

অবশ্য বিশ শতকের শেষভাগে দাঁড়িয়ে 'সুন্দরিকা দুয়ানিয়া'র তীরের জনপদ 'আর বিশেষ মাথা ঘামায় না আন্দোলন নিয়ে। কিন্তু আজ তারা যা সুফল ভোগ করছে, যেমন টিউকল, আন্তর্জাতিক অর্থ সাহায্যে গড়ে তোলা 'আটফ্যাডের রাস্তা', এ সবগুলিই হচ্ছে সেই আন্দোলনের সুফল। কারণ সেই সময় এই স্থানটি ছিল দুর্গম। অথচ নগর রাজধানী থেকে মাত্র পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে অবস্থিত। উপন্যাসে দিন্দাবাবুর ভাবনায় ধরা পড়ে সাতচল্লিশ-আটচল্লিশের রাস্তাঘাটের অবস্থার কথা "অখন কত ভ্যান ম্যাটাডর। সৌ উনিশশো সাতচল্লিশ - আটচল্লিশে যদি অমন রাস্তা করি দিতো ব্রিটিশ কিংবা স্বাধীন গরমেন্ট ..... তা হইলে পুলিশের জিপ মিলিটারির ঠেলায় কি কমনিস্টরা এই খানে ঘাঁটি গড়তে পারিত? পট পট ধরিত, ফাটকে আটকে পচাইত সেই অশোক বোস কংসারি প্রভাস রায়দের।"[৪৩] এখন রাস্তায়

রাস্তায় 'টিউকল' যেখান থেকে বিশুদ্ধ জল খাচ্ছে জনসাধারণ। অথচ আন্দোলনের সময় খাওয়ার জল বলতে তো 'পুকুর ডোবার জল।' যেটা খেয়ে "বছর বছর কলেরা। মড়ক-পেটের বাচ্চা মরা জন্মাইতেছে। আর পাঁচ সাত দিনের বাচ্চা তো পেটের রোগে যায় যায়।..... এই টিউকল হাওয়া কলে আসে নাই গো? পুলিশ থানা হাকিম মন্ত্রী জেরবার হইছিলি বলে তো অখন পথ হাঁটলি টিউকল"[৪৪]

এই যে 'টিউকল', 'রাস্তা', এগুলো সহজে এই নোনাগাঙের দেশে আসে নি। "জজ এস.পি গভরনর খবর পাইতো নি— এ জঙ্গুলে দ্বীপে মানুষ থাকে.. তাদের আবার পেটের দুঃখু! মনের ইচ্ছা! ছেলেপুলের লিখাপড়া! লাটদার জোতদাররা এস.ডি.ও হাসপাতালকে যা নিজের মতো কইতো .....তারা সব মেনে লিতো! তার বাহারে যে আসল সত্যিটা আছে, ঘি মাংস খাওয়া মাথায় ডি.এম. জজ মন্ত্রী বাবুরা ধরতে পারতো নি। দামী মাথায় ছোট কথা ঢুকতো নি। সৌ ঢুকাইতে তো আগুন জ্বালাইছি, লাটদারি পুড়াইছি"।[৪৫]

কৃষকের প্রতি হওয়া অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি। অমলেন্দু সেনগুপ্তর গ্রন্থে কাকদ্বীপ অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের বিস্তৃত আলোচনা পাই। "১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিমবাংলার অন্য কোথাও তেভাগা আন্দোলনের অস্তিত্ব ছিল না। এখানে কিন্তু তেভাগা আন্দোলন থেমে যায় নি। কৃষকরা নিজ খামারে ধান তুলেছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে ধান কাটা অবধি কাকদ্বীপ সরকারি ভাষার 'অশান্ত'। ১৯৪৮-৪৯ সালেও তেভাগার দাবিই জোরদার থাকে। ১৯৪৯ সালে আন্দোলনের নবপর্যায় শুরু। তিনভাগের দু ভাগ নয়। সমস্ত ধানই চাইল কৃষক, চাইল 'লাঙল যার জমি তার' হোক।[৪৬] 'স্বজন ভূমি' উপন্যাস জুড়ে রয়েছে 'তেভাগা আন্দোলনে'র স্মৃতি। অতুল কামিল্যার স্মৃতিতে "সেই ছোকরা বয়সে যৌবনের দিনে বড় বড় লিডার কমরেডদের অনেক যুক্তি, দেশ-বিদেশের কত ঘটনা ইতিহাস মুখে শুনতে শুনতে ... মনটা কেমন হয়ে যেত! কত তুচ্ছ লাগতো

নিজের জীবনটাকে.....। মনে বড় বাজতো, ভাইসব, কমরেড.... কত নির্যাতিত গরিব আত্মীয় আপনাদের এই সুন্দরবনে নোনা মাটিতে.. তাদের জন্য আপনারা কিছু ভাববেন নি? করবেন নি? মানবজনম কি শুধু ছাগল কুকুরের মতো? কিছু কী করার নাইগো.....মানুষের জন্যে কিছু করে যাবেন নি.....।"[৪৭] কমরেডদের এই ডাকে চাষিরা সাড়া দিয়েছিল।"এই জঙ্গল সাফাই করে চাষের জমি, বসবাসের যোগ্য ভূমি তৈরি করা মানুষ এই লাট সুন্দরবন আবাদের। তাদের তো বটে, নিজের মা বোনদের ইজ্জত রহ্লা.....লাটদার চকদারদের নির্যাতন থেকে যদি রহ্লা করতে আমার জীবন দিতে লাগে দুবো-দুবো—শহিদ হ্লুদিরাম কত কচি বয়সে প্রাণ দিছে.... না হয় আমিই দুবো..."।[৪৮]

অতুল কামিল্যা, গজেন মালি গুণধর মাইতিরা এই আদর্শ বুকে নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি এই প্রান্তিক অঞ্চলের উপেহ্লিত মানুষগুলিকে অধিকারসচেতন করে তোলার পরিকল্পনা নেয়। "১৯৪৭ সালে ঠিক হল তাদের মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। বলতে হবে তোমরাও মানুষ। শুধু ফসল পাওয়ানো নয়, মনুষ্যত্ব-ও জাগাতে হবে। রাজনগরে প্রথম জুতো পায়ে দিয়ে চাষিরা কাছারির সামনে চলা ফেরা করল"।[৪৯]

প্রশাসনও কিন্তু থেমে থাকল না। ওই বছরই প্রথম পুলিশ ক্যাম্প বসল এবং প্রত্যেক কাছারি বাড়ি হয়ে গেল পুলিশ ক্যাম্প। উকিল অতুল শালমলের নেতৃত্বে গঠিত হয় জোতদার অ্যাসোসিয়েশন। অন্যদিকে আন্দোলনও ছড়িয়ে পড়ছে। "চাষিরা ধান পাচ্ছে—নিজস্ব খামারে অথবা পঞ্চায়েতি খামারে তারা ধান রাখছে। ১৯৪৮ সালে এসে পড়ল নতুন পার্টি লাইন— ধাক্কা মারলেই এই সরকার পড়ে যাবে। সোভিয়েট গড়ার জায়গা হিসেবে লয়ালগঞ্জকে বেছে নেওয়া হল। অশোক বোস এল। অস্ত্রশিহ্লার তালিম দেওয়ার জন্যে জয়পাল সিংও এসে দিন সাতেক থেকে গেল। সাওঁতাল মঙ্গল সর্দার, গজেন মাঝি, ভূষণ কামিলা আর বিজয় মণ্ডল হল শিহ্লার্থী।"[৫০]

অতুল কামিল্যা খুব সহজেই পিস্তল পাইপগান ভেঙেচুরে আবার পিটিয়ে পাটিয়ে সাইজে এনে চালু করে দিতে পারতো নিমেষে। মালমশলা থাকলে অতি দ্রুত সে ছেনি হাতুড়ি লোহাকাটা করাত দিয়ে পাইপগান তৈরি করতে পারতো। আর সেসব চালান করা হতো গাঙ জঙ্গলের গোপন ঘাঁটিতে। তাদের গেরিলা ফাইটের মহড়া চলত সামন্তদের কাছারি বাড়ির ধ্বংসস্তুপের কোটরে। ট্রেঞ্চে। ১৯৪৮ সাল থেকে ইস্টার্ন রাইফেল বাহিনী রাজনগর, লয়ালগঞ্জ ও শিবরামপুর ঘিরে রাখল। বিপ্-বীদল জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ল। মিলিটারি ফোর্সকে সাহায্য করত লাটদার নায়েবের মাইনে করা দু-পাঁচজন মজুর পাইক। তারা চর হয়ে খোঁজ নিচ্ছে রাতের অন্ধকারে কে বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসে। সেই বগড়া জঙ্গল ও বাজবরণের ঘন ঝাড়ে ঝাড়ে পুলিশ। ওয়ারলেস সেট বসানো মোটরলঞ্চে করে জল তোলপাড় করে বিপ্-বীদের খুঁজে বেড়াতে লাগল। এদিকে ঘন জঙ্গলে বিপ্-বীরা অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। গোরিলা জীবনের ছবি রয়েছে উপন্যাসে ঃ "গিরা মাছ চিবাইছি... কাঁকড়া জ্যান্ত কাঁকড়া এপিঠ ওপিঠ ঝলসাইয়ে লিয়ে কাঁচা মাছ চিবাইছি।"[৫১] এদিকে সবকার হুলিয়া জারি করেছে গজেন মালির মাথা দশ হাজার, গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থা বন্দুক উচিঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে হায়দরাবাদে নিজামশাহীরা তেলেঙ্গানা দমন করছে, এদিকে তেভাগা জেগে উঠছে । দ্বীপের অসহায় মানুষগুলোর লাটদার চকদার নায়েব লেঠেলদের দেখে যেমন ভয় তেমনি কংসারী হালদার, অশোক বোস, প্রভাস রায়, জগন্নাথ, গুণধর, যতীন মাইতি, মন্মথ ঘড়ুই তাহের মিএহ্লাদের কাছে পেলেই বুক ভর্তি আশ্বাস। চাষি মানুষদের দু-চোখে স্বপ্ন। অথচ এই স্বপ্ন সাব্যস্ত করতে গিয়েই তো মিছিল- আন্দোলন। "মিছিলের অগ্রভাগে মা ভাইবোন..... কাঠের বন্দুকের ধাতব নলে নিষ্প্রাণ মানুষগুলো। সব তছনছ! মানুষের দাবিতে নতুন আইন গড়তে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত আইনের থাবায় নোনামাটির দেশের প্রতিবাদী মানুষগুলো দিশেহারা।"[৫২]

পুলিশের নির্যাতনের হাত থেকে মহিলারাও রেহাই পায় নি। ১৯৪৮ এর ৪ নভেম্বর চন্দনপিড়িতে গুলি চলল, মারা গেল অহল্যা, সরোজিনী ও অশ্বিনী। ঘটনাটির বিবরণ উপন্যাসে আমরা এভাবে পাই – ১৯৪৮ এর ৪ নভেম্বর গ্রামে এক মিটিং হয়। ৬ নভেম্বর সকালে ধান কাটা শুরু হয়। হঠাৎ পুলিশ এল। স্থানীয় কৃষক সমিতির সেক্রেটারি রাখাল জানাকে ধরতে এসেছে। বোষ্টম শশধর দাস শাঁখ বাজিয়ে সকলকে সর্তক করে দেয়। শাঁখ শুনে সবাই সুধীর মাইতির বাড়িতে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসের দিকে যায়। মেয়েরা আগে, তাদের হাতে ঝাঁটা ও বটি। পুরুষেরা লাঠি হাতে পেছনে। সামনে দেখে, সেনেদের কাছারির নায়েব পরেশ দাস ও কর্মচারী রাইচরণ পুলিশকে পথ দেখাচ্ছে। ঘর চিনিয়ে দিচ্ছে। এখানে পুলিশের সঙ্গে কৃষকের হাতাহাতি হয়, কৃষকেরা পুলিশের রাইফেল কেড়ে নেয়। শেষে পুলিশ হুমা চেয়ে বন্দুক ফেরত পায় ও পরেশকে রেখে চলে যায়। এরপর আরো বেশি পুলিশ সঙ্গে করে দারোগা ফিরে আসে। কৃষকরা মহেন্দ্র বিজলীর হাতে পরেশকে রেখে সেনেদের কাছারির দিকে ফিরে যায়। ধান হ্লেতের পাশে কৃষক–পুলিশ মুখোমুখি। রাইচরণ চেঁচায় 'ফায়ার ফায়ার'। দারোগা বাঁশি বাজায় ও গুলি শুরু হয়। রতিকান্ত সেইদিনের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলে— "প্রথমে ফটাস করে গুলি বিঁধলো অশ্বিনীর বুকে। জল....জল .... দিচ্ছিল বোন সরোজিনী বাদা থিকে আঁচল চুবিয়ে চুবিয়ে অশ্বিনীর গালে। সরোজিনীর পেট–ফুটা করি দিলে। উত্তমী বাতাসী... মা অহল্যারও। লাঠি হাতে ঝাঁপাইলে গজেন ভুঁইয়া.... সে–ও শেষ ! .... মা অহল্যা পেটে টোটার জ্বালা লিয়া এক পাক দৌঁড়য়.... তারপর হাঁটে। গোপালের দোরকে লেযায়ে গালে জল দিচ্ছি.... দ্বীপের শেষ জল। তারপর বাবার কোলে মাথা.... আমার কোলে শুয়ে মা আমার .... মাটির মতো ঠাণ্ডা।"[৫৩] সেদিন নিহত হয় অহল্যা, অশ্বিনী, সরোজিনী, উত্তমী, বাতাসী, গজেন, দেবেন ও নগেন। অহল্যা ও বাতাসী ছাড়া অন্যদের দেহ পুলিশ নিয়ে যায়। পরদিন অহল্যাকে তাদেরই মাটিতে দাহ করা হয়। আর কৃষকরা পরেশকে দেয় চরম শাস্তি।

তাকে কুচোকুচো করে কেটে মাটিতে পুঁতে রাখে।

সংগ্রামী কৃষকদের ধরতে পুলিশ চিরুনি তল্লাসি শুরু করে। পাল্লা দিয়ে কৃষকরাও স্কুল, কাছারি পোড়াচ্ছে। কারণ স্কুল বাড়ি থাকলেই তো পুলিশ মিলিটারি ক্যাম্প তৈরি করে, তাঁবু গেড়ে সেনা ছাউনি হয়। ভাবতে অবাক লাগে স্বাধীন দেশের, দেশীয় শাসকবর্গের চালিত পুলিশ কিন্তু জোতদার, লাটদারদের অন্যায় জুলুমের বিচার করল না। গরীব, নিরন্ন মানুষগুলোর সম্পূর্ণ ন্যায্য দাবিকে দাবিয়ে রাখার জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করল। অথচ 'নেহেরুজী কৃষকদের জন্য ভাবছে একটা কিছু সুরাহা হবে'।[৫৪]

নিত্য মাইতি যিনি স্বদেশি করতে গিয়ে সাহেবদের পুলিশের রুলের বাড়ি খেয়েছিলেন, তিনি ও কৃষকদের বোঝান, "বৃটিশ তাড়িয়ে সবে দেশটাকে হাতে নিলো মানুষগুলো, লাটদার, জোতদারের বিরুদ্ধে চাষি খেপিয়ে দিচ্ছো— কাজটা কি ভালো হচ্ছে?"[৫৫] অথচ এই নিত্য মাইতির সে সময় নায়েব গোমস্তাদের সঙ্গে কত ওঠাবসা, "লাটদারের কাছারি বাড়িতে দারোগা পুলিশ এলেই নিত্যবাবুর ডাক, ডিশভর্তি ভাজা মাছ, গরম দুধ বসিয়ে দারোগার ইংরিজি বাংলায় কত পরামর্শ— শেলটার, মিটিং অত্যাচার, আর্মস— "[৫৬] সুতরাং এই কৃষকদের কাছে শাসক দলের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। কৃষকদের কথা তাদের কানে পৌঁছায় না। জোতদার লাটদারেরা যা বোঝায় তারা সেটাই মেনে নেয়। অর্থাৎ তাদের পক্ষ নেয়।

তাই নিজেদের সীমিত শক্তি নিয়ে একদিকে বিপুল রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা ও অপরদিকে প্রতিকূল পরিবেশে লড়াই করে এই জঙ্গি কৃষকদল নিজেদের হকের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। প্রতিপক্ষের গুলি, খাদ্যের অভাব, আশ্রয়ের অভাবও তাদের ইচ্ছা শক্তিকে দমন করতে পারেনি। "লাটদার জোতদারদের ত্রাস তে-ভাগার গজেন মালি। গরমেন্টের ঘর থেকে 'মালির পো'র মাথার দাম দশ হাজার টাকা। সেই গজেন মালির সঙ্গী হয়ে বিজয় তো মাসের পর মাস পলাতক। আত্মগোপনকারী, নোনা গাঙ সমুদ্দুরে জেলে ডিঙি নিয়ে মাসাধিক

কাল পুলিশ মিলিটারিকে বোকা করে দিয়ে কোনো বাঘের জঙ্গলে, খাদ্যহীন দ্বীপ, চড়ায় কাটিয়েছিল দিনের বেলায়। রাতের অন্ধকারে।”[৫৭]

পুলিশি আক্রমণ প্রতিহত করে সুন্দর বনের তেভাগা লড়াই চলে গোরিলা কায়দায় চন্দনপিঁড়ি, দরিপুর, বুধাখালি, শিবরামপুর গোটা লাটজুড়ে চাষির সশস্ত্র আন্দোলন গোপন ঘাঁটি থেকে পরিচালনা করেন কংসারি হালদার, অশোক বোস প্রমুখ কমিউনিস্ট লিডাররা। অন্য দিকে সমস্ত কাকদ্বীপ জুড়ে তখন পুলিশ মিলিটারি ছেয়ে আছে। পাতিবুনিয়া, দরিপুরে লোহার খুঁটি পুঁতে টরে টক্কা আওয়াজে ওয়ারলেস, পুলিশ-মিলিটারি ভর্তি লঞ্চ নোনজল ছিঁড়ে টহল দিচ্ছে গোটা লাটে। নিম্ন দক্ষিণবঙ্গের নোনামাটিতে ঝোপজঙ্গল তছনছ করে তাল্লাশি চলছে কমিউনিস্ট ধরার জন্য। গজেন মালি বিজয় শ্যাম মণ্ডলরা ডিঙি ভাসিয়ে নোনা গাঙ সমুদ্রে ভয়ঙ্কর কষ্টে আত্মগোপন করে আছে।

আমরা “উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব” গ্রন্থে এঁদের ধরা পড়ার বিবরণ পাই— “বকখালির চরে গজেন মালি ও বিজয় মণ্ডল আগ্নেয়াস্ত্র সমেত ধরা পড়েন, অশোক বোস এলাকা ছেড়ে চলে যান। তিনি তখন প্রশাসনের সবচাইতে চিহ্নিত ব্যাক্তি। জমিদার ও সরকারি তরফ থেকে তাঁর মাথার ওপর বহু হাজার টাকা পুরস্কার— জীবিত বা মৃত.....

ধরাপড়ে মোট ২৭ জন— যদিও কাকদ্বীপ ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানো হল ৩৬ জনকে। সে সময় ধরা পড়েন নি অশোক বোস, কংসারি হালদার, যোগেন্দ্র গুড়িয়া,ঈশ্বর কামিলা, ভগুদাস ও হরিপদ শাসমল। এঁদের পলাতক অবস্থাতেই মামলা হয়। শেষ অবধি ১৯৫৩ সালের ১১ ডিসেম্বর ট্রাইব্যুনালের রায়ে ৯ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তারা হলেন: গজেন মালি, বিজয় মণ্ডল, ভূষণ কামিলা, মাণিক হাজরা, তারিণী সাও, ভীম ঘড়ুই, দ্বিজেন্দ্র দিন্দা, হ্লীরোদ বেরা ও সুজয় বারিক। বাকি আঠারো জন ছাড়া পায়। এছাড়াও অবশ্য অন্যান্য বহু মামলায় বিভিন্ন এলাকায় অনেক কৃষক কর্মীকে ধরা হয় ও তাঁদের দীর্ঘদিন

জেলে থাকতে হয়।"[৫৮]

জেলে তাদের অশেষ নির্যাতন সইতে হয়েছিল। আর এদিকে বাড়িতে ঘরের বউ মেয়েরা ভিহ্লা করতে বের হল কলকাতায়। ঝি খাটতে গেল মামলার খরচ জোগাতে। জেল থেকে ছাড়ানোর জন্য উকিল মোক্তারের পয়সা জোগাড় করতে।

এত ত্যাগস্বীকার, এত কষ্টের বিনিময়ে তাঁরা কী লাভ করলেন। অবশ্য লাটদার চকদাররা তাদের হাজার হাজার বিঘা জমি হারাল। ভেস্টেড হয়ে সেগুলো চাষির নামে করতে সরকার বাধ্য হল। হাভাতে চাষিদের অন্নসংস্থান ও ভিটেমাটিটুকু জুটল কিন্তু এর বেশি কিছু হল কি? তাহলে তাঁদের উত্তরুপুরুষ আজ কেন আহ্লেপ করে। "কি ছাই বাতাসি.... অহল্যা..... অশ্বিনী সরোজিনী করে এউ লোকগুলো? কী করছ্যো তোমরা গুলি বন্দুক খায়ে স্বর্গ রাজ্য.....। তখন নায়েব গোমস্তাদের দর্প— অখন পঞ্চায়েত পুলিশবাবুদের অহঙ্কার দাপট তো কম নয়।"[৫৯] বস্তুত আমরা উপন্যাসে দেখি এখন সব হ্লমতার কেন্দ্র হল পঞ্চায়েত। সেই পঞ্চায়েতের কর্তাব্যক্তি তো বেশির ভাগ নতুন ছোকরারা। তারা বেশির ভাগই 'ঠকরামকরি'তে ওস্তাদ।

দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে মিলিয়ে এখানেও ইস্কুল হয়েছে, সামাজিক নানা উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সাহ্লরতা অভিযান চলছে। সেখানে তাদেরই শিহ্লিত ছেলে দিবাকর নিষ্ঠার সঙ্গে 'স্বেচ্ছাসেবী শিহ্লক' হয়ে বুড়ো চাষিদের অহ্লরজ্ঞান শেখাচ্ছে। অবশ্য এতেও রয়েছে আয়রনি! সরকারি প্রকল্পের কাজ দেখতে আসছে সরকারি অফিসার বি.ডি.ও। কৃষকদের চোখে তাদের অবস্থা ধরা পড়ে "তানকে সব মাস ফুরাইলে হাজার হাজার টাকা মাইনা—জিপগাড়ি লিয়া পঞ্চায়েত অফিসকে আইলি মিটিং করাইতে। তার পুইস্যা লিয়ে কাজ দ্যাখতে আইঠে আর দিবাকরদের পরামর্শ দিতেছে, বিনি পুইস্যায় লিখাপড়া শেখাও। দেশের কাজ— দশের কাজ।"[৬০] সরকারি অফিসারদের কাজের নমুনা এই উপন্যাসটিতে

আরো পাওয়া যায়। স্কুল বিল্ডিং এর উন্নতির জন্য গ্রামের লোকেরা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত নিয়ে গেলে ম্যাজিষ্ট্রেটটি পাঁচশো টাকা ঘুষ না পাওয়া পর্যন্ত দরখাস্তে সইই করে নি। অথচ 'সৌ সাহেব ও কইছিলি'। দেশের মানুষকে লিখা শিখান, পড়া শিখান, এটা দেশের কাজ— মানুষের কাজ। আপনাদের শিহ্লাকে প্রয়োগ করুন। বিনি পুইস্যার কাজ হইলেও এইটা খুব জরুরি কর্তব্য। সামাজিক দায়।"[৬১] কথাটির অন্তঃসারশূন্যত্য সকলেরই বোধগম্য। তবুও বয়স্ক সাহ্লরতা মিশনে চাষিরা অহ্লরজ্ঞান পেতে চান। যাতে তাঁরা উৎপাদিত ফসলের মূল্য সঠিক ভাবে বুঝে নিতে পারেন, যাতে তাঁদের আড়তদার ঠকাতে না পারে।

যে নিষ্ঠা, সততা নিয়ে কৃষকরা আন্দোলনে নেমেছিলেন, এখন চর্তুদিকে সেই নিষ্ঠা ও সততার অভাব পরিলহ্লিত হয়। এ এমন একটা সময় সেখানে প্রত্যেকেই নিজের আখের গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। কেন এমন হল তা আলাদা চর্চার বিষয়। কিন্তু উপন্যাসটির শেষে লেখক সেই সংগ্রামের ইঙ্গিত বজায় রেখেছেন। কৃষক সংগ্রামীরা সরকারি পেনশন পান, কিন্তু তা এত নগণ্য যে দু বস্তা চাল আনতেই ফুরিয়ে যায়। বিজয় মণ্ডল তাঁর ছেলের চিকিৎসা করাতে পারেন না। অতুল কামিল্যার ছেলে অল্প পয়সার অভাবে কারিগরি ট্রেইনিং নিতে পারছে না। অথচ তাঁদের থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা অধিক পেনশন পান। তাই শম্ভুর মনে হয় কৃষক সংগ্রাম না করে তার বাবা স্বদেশি করলে অনেক লাভ হত। অতুল কামিল্যা, রতিকান্ত এঁরা সকলে মিলে ঠিক করেন তাঁদের পেনশন বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করতে হবে সরকারের কাছে। আবার তাদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তেভাগার আন্দোলন তাদের মধ্যে জন্ম দিয়েছে এক অনমনীয় জেদ, অটুট সংগ্রামের সংকল্প। এটাই এই আন্দোলনটির সার্থকতা।

৪

বাংলা উপন্যাসে তেভাগা আন্দোলনের প্রভাব – প্রাতিক্রিয়া বুঝতে গিয়ে আমরা যে

তিনটি উপন্যাস আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি, তার মধ্যে দুটি উপন্যাসে, ('নয়নপুরের মাটি এবং লখীন্দর দিগার') তেভাগা আন্দোলনই কেন্দ্রীয় আধেয় বা বিষয় নয়। অপরদিকে, সরাসরি তেভাগার ঐতিহাসিক চরিত্ররা উপন্যাসের পাত্রপাত্রী হয়ে পড়েছে 'স্বজনভূমি' তে। সরাসরি তেভাগা আন্দেলন খুব বেশি উপন্যাসের বিষয় হয়ে ওঠেনি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সমকালীন লেখক উত্তরবঙ্গের কৃষক বিদ্রোহগুলির উত্তাপ তাঁদের উপন্যাসে সেভাবে ধারণ করেন নি। তবে বেশ কিছু মর্মস্পর্শী গল্পে সমকালীন আধিয়ার বিদ্রোহগুলির ছায়া যে পড়েছিল, এই পাঠক সে বিষয়ে অনবহিত নয়। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হল উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসে সরাসরি আধিয়ারদের সংগ্রাম এবং নিজের গোলানে ফসল তোলার সংগ্রামী পর্বের প্রতিবেদন খুব বেশি নেই। 'নয়নপুরের মাটি' উপন্যাসে সে সময়কার পরিস্থিতির আভাস অন্তত পাওয়া যায়। হরেরাম, অখিল এরা নানা জায়গায় কৃষকদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার খবর জেনেছে। তাদের মধ্যেও জমিদার ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে এবং নিজেদের ফসল রাখতে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ধম্মঘটের পুজো দেওয়া – আধিয়ার হরেরাম এর মৃত্যু এগুলি উপন্যাসের নায়ক মহিমকে বিচলিত করেছে। উপন্যাসে কমিউনিস্ট কর্মী গৌরাঙ্গকে কৃষক আন্দোলনে খুব সক্রিয় থাকতে দেখা যায় নি। বস্তুত অ-কৃষক মধ্যশ্রেণির ছাত্র যুবকরা চল্লিশের দশকের আন্দোলনে খুব বেশি যুক্ত ছিলেন না। সমরেশ এই বাস্তব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। অন্যদিকে সরাসরি সংগঠিত এলাকার বাইরে যে স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, 'নয়নপুরের মাটি' এবং 'লখীন্দর দিগার' উপন্যাস দুটিতেই তার ইশারা রয়েছে।

এই উপন্যাসগুলিতে যা প্রাপ্তি, তা তেভাগার প্রাণিধানযোগ্য ফসল। বাংলা উপন্যাসে কৃষক চরিত্রের এই সংগ্রামী চেহারা এর আগে আমরা লক্ষ্য করিনি। শরৎচন্দ্র পর্যন্ত সাহিত্যে

কৃষক নেই বললেই চলে। অচিন্ত্যকুমারের চাষি চেতনাহীন, নির্জীব, বাকহারা। নীল বিদ্রোহের সময়ে কৃষকের যে সংগ্রামী চেহারা দেখা গেছে, তা ঔপনিবেশিক মধ্যবর্গভুক্ত বাঙালি কলমচিদের দৃষ্টির বাইরে থেকে গেছে। উপন্যাসের যুগেও অন্তত ৪০ এর দশক পর্যন্ত, সেভাবে কৃষক, তাদের সংঘচেতনা, আধিয়ার জীবনের যন্ত্রণা ও ক্ষোভ লক্ষ্য করা যায় নি। কিন্তু ৪০এর দশকের তেভাগা লড়াই থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারল না উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত-মেদুর উপন্যাসের জগৎ। 'নয়নপুরের মাটি' কিংবা 'লখীন্দর দিগার' উপন্যাসের যে ভূমি, তা তেভাগার সংগঠিত লড়াইর ক্ষেত্র না হলেও, বেশ বোঝা যাচ্ছে, তেভাগার বার্তা, তেভাগার চেতনা ছাড়িয়েছিল সর্বত্র। জমিদার, জোতদার - বিরোধী মানসিকতা, সংগ্রামের প্রেরণা চল্লিশের দশকের বাংলার সব অঞ্চলের কৃষক অর্জন করেছিল। তেভাগার চেতনা স্বাধীনতা উত্তর কালে যখন কৃষক সভার 'লাঙল যার জমি তার' স্লোগান এর দিকে এগিয়েছে, সেই সময়কার প্রতিবেদন 'স্বজনভূমি' উপন্যাস। অন্তেবাসী, নিরুদ্ধকণ্ঠ কৃষকের কণ্ঠে প্রতিবাদ প্রতিরোধ-ঘৃণা ও সংগ্রামের যে ভাষা এনে দিয়েছে চল্লিশের দশকের কৃষক আন্দোলন, সে ভাষার খানিকটা অন্তত শহুরে মধ্যবর্গীয় লেখকরাও যে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন, সমরেশ ও গুণময়ের প্রতিবেদনে তার সাক্ষ্য রয়েছে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় তেভাগার লড়াইকে সম্মানিত করেছেন উত্তরসূরীর শ্রদ্ধা ও মোহমুক্ত ইতিহাসচেতনার যুগনদ্ধ প্রাণোদনায়। তবু, আন্দোলনের যে ব্যাপ্তি ছিল, সে তুলনায় বাংলা সাহিত্যে তেভাগার প্রতিক্রিয়া সীমিত হয়েই রইল।

উল্লেখপঞ্জিঃ

(১) পাল রবিন ঃ উপন্যাসের বর্ণময় ভুবন,কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৭৬।

(২) ভট্টাচার্য তপোধীরঃ লখীন্দর দিগার ঃ সময় ভাবাদর্শ ও উপন্যাস; উপন্যাসের সময়, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৮৫।

(৩) ঐ, পৃ. ৮৫।

(৪) মান্না গুণময় ঃ লখীন্দর দিগার, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১।

(৫) ঐ, পৃ. ৪।

(৬) ঐ, পৃ. ৪।

(৭) ঐ, পৃ. ২১।

(৮) ঐ, পৃ. ৪২।

(৯) ঐ, পৃ. ৪২।

(১০) ঐ, পৃ. ৩৬।

(১১) ঐ, পৃ. ১৪।

(১২) ঐ, পৃ. ৪০।

(১৩) ঐ, পৃ. ৩৯।

(১৪) ঐ, পৃ. ৪৯।

(১৫) কমিউনিস্ট পার্টির এই ভূমিকা এবং আধিয়ার আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রঃ কুণাল চট্টোপাধ্যায়ঃ তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২৫-৩৮।

(১৬) মান্না গুণময় ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

(১৭) ঐ, পৃ. ৩৩।

(১৮) ঐ, পৃ. ৩৪।

(১৯) ঐ, পৃ. ৬৬।

(২০) দাশ সুস্নাত ঃ 'অবিভক্ত বাঙলার কৃষক সংগ্রাম, তেভাগা আন্দোলনের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষিত-পর্যালোচনা-পুনর্বিচার, কলকাতা ২০১২, পৃ. ১১১।

(২১) মান্না গুণময় ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

(২২) ঐ, পৃ. ৮২।

(২৩) ঐ, পৃ. ১০৭।

(২৪) ঐ, পৃ. ১১০।

(২৫) ঐ, পৃ. ১২৪।

(২৬) ঐ, পৃ. ১৪৫।

(২৭) ঐ, পৃ. ১৪৪-১৪৫।

(২৮) রায়চৌধুরী ঝুমা ঃ কথা সাহিত্যে সমরশে বসু ঃ সামগ্রিক মূল্যায়ন, কলকাতা ২০০৭, পৃ. ১১০।

(২৯) বসু সমরেশ ঃ নয়নপুরের মাটি, কলকাতা ১৯৮৯, পৃ. ১২।

(৩০) ঐ, পৃ. ২১।

(৩১) ঐ, পৃ. ১০।

(৩২) ঐ, পৃ. ৬২।

(৩৩) ঐ, পৃ. ৪৬।

(৩৪) ঐ, পৃ. ৪৭।

(৩৫) ঐ, পৃ. ৮০।

(৩৬) ঐ, পৃ. ৭২।

(৩৭) ঐ, পৃ. ১২৬।

(৩৮) ঐ, পৃ. ১৪২।

(৩৯) চট্টোপাধ্যায় ঝড়েশ্বর ঃ স্বজনভূমি, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৫৪।

(৪০) উদ্ধৃত ঃ সেন সুনীল ঃ অবিভক্ত বাঙলার কৃষক সংগ্রাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

(৪১) উদ্ধৃত ঃ কংসারী হালদার, উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮-৯৯।

(৪২) চট্টোপাধ্যায় ঝড়েশ্বর ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

(৪৩) ঐ, পৃ. ১১১।

(৪৪) ঐ, পৃ. ৮২।

(৪৫) ঐ, পৃ. ৭৭।

(৪৬) দ্রষ্টব্য ঃ উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮।

(৪৭) চট্টোপাধ্যায় ঝড়েশ্বর ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

(৪৮) ঐ, পৃ.২২।

(৪৯) ঐ, পৃ. ২৯৯।

(৫০) সেনগুপ্ত অমলেন্দুঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯।

(৫১) চট্টোপাধ্যায় ঝড়েশ্বর ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

(৫২) ঐ, পৃ. ৮০।

(৫৩) ঐ, পৃ. ১২৫-১২৬।

(৫৪) ঐ, পৃ. ১৭৭।

(৫৫) ঐ, পৃ. ১৭৯।

(৫৬) ঐ, পৃ. ১৭৯।

(৫৭) ঐ, পৃ. ১৬৯।

(৫৮) সেনগুপ্ত অমলেন্দু ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩।

(৫৯) চট্টোপাধ্যায় ঝড়েশ্বর ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২-১৫৩।

(৬০) ঐ, পৃ. ১২৩।

(৬১) ঐ, পৃ. ১১৪।